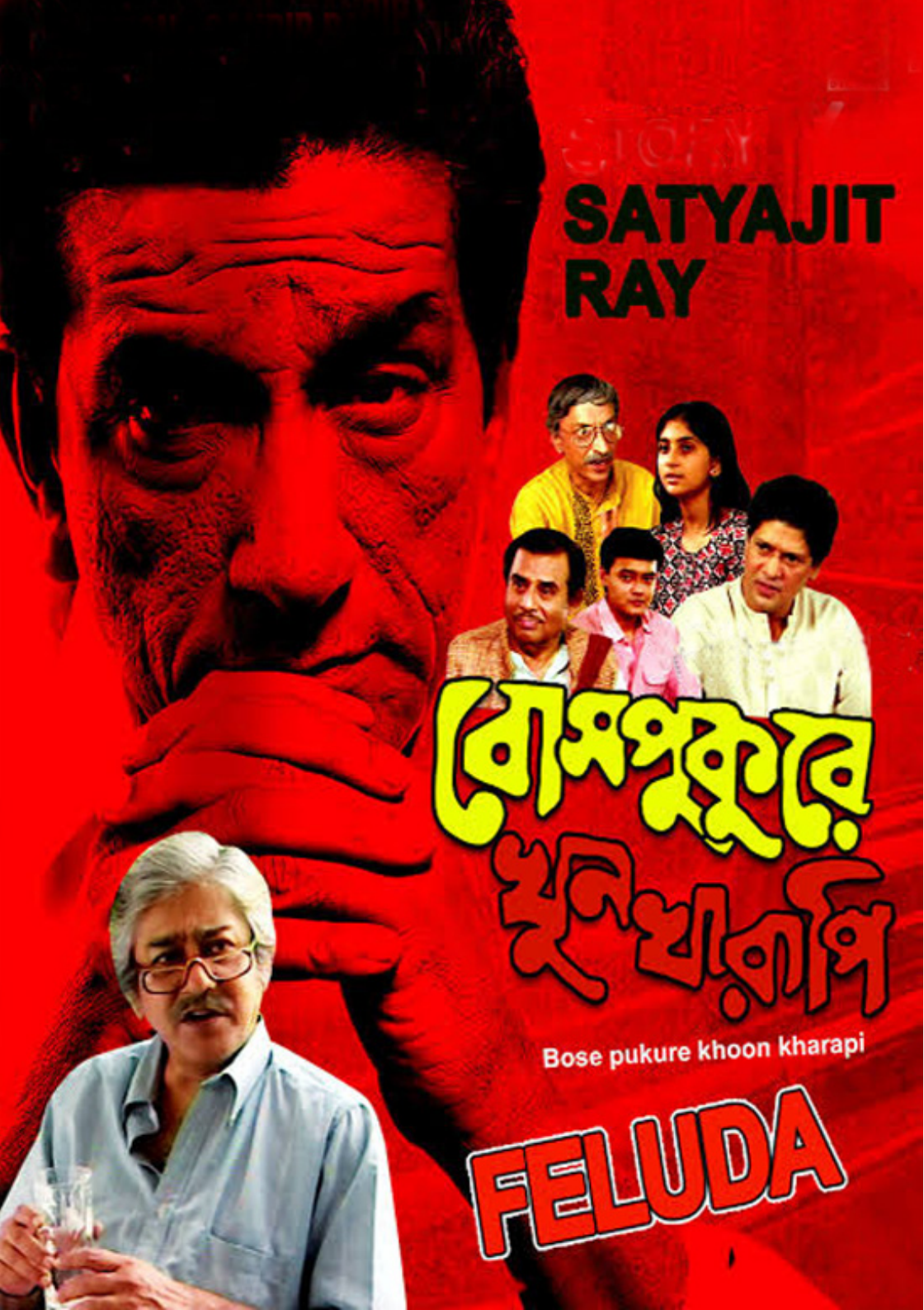
SATYAJIT
RAY
বোসপুকুরে
খুন খারাপি
Bose pukure khoon kharapi
FELUDA

ফেলুদা

বোসপুকুরে খুনখারাপি

সত্যজিৎ রায়

১

আমাদের বন্ধু রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর পাল্লায় পড়ে শেষটায় যাত্রা দেখতে হল। এখনকার সবচেয়ে নামকরা যাত্রার দল ভারত অপেরার হিট নাটক সূর্যতোরণ। এটা বলতেই হবে যে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ জমে যেতে হয়। কোথাও কোনও টিলেঢালা ব্যাপার নেই; অ্যাকটিং একটু রং চড়া হলেও কাউকেই কাঁচা বলা যায় না। লালমোহনবাবু ফেরার পথে বললেন, আমার গল্পের যা গুণ, এরও তাই! মনকে টানবার শক্তি আছে পুরোপুরি। অথচ তলিয়ে দেখুন, দেখবেন অনেক ফাঁক, অনেক ফাঁকি।

কথাটা বড়াই-এর মতো শোনালেও, অস্বীকার করা যায় না। লালমোহনবাবুর লেখাও তলিয়ে দেখলে তাতে তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। অথচ ভদ্রলোকের পপুলারিটি কিন্তু একটা চমক লাগার মতো ব্যাপার। নতুন বই বেরোনোর পরদিন থেকে একটানা তিন মাস বেস্ট সেলর লিস্টে নাম থাকে। অথচ উনি বেশি লেখেন না; বছরে দুটো উপন্যাস-একটা বৈশাখে, একটা পুজোয়। আজকাল তথ্যের ভুল আগের চেয়ে অনেক কম থাকে। কারণ শুধু যে ফেলুদাকে পাণ্ডুলিপি –দেখিয়ে নেন তা নয়, সম্প্রতি নিজেও অনেক রকম এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি কিনেছেন। সেগুলোর যে সদ্ব্যবহার হচ্ছে সেটা বইগুলো পড়লেই বোঝা যায়।

সূর্যতোরণ যাত্রা নামটা প্রথমেই করার কারণ হল, এই যাত্রার সঙ্গে যুক্ত এক ভদ্রলোককে নিয়েই আমাদের এবারের তদন্ত। ভদ্রলোকের নাম ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য। এরই লেখা নাটক, গানও এর লেখা, অর্থাৎ নিজেই গীতিকার—আর ইনি নিজেই অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজান। মোট কথা গুণী লোক। তাঁকে নিয়ে যে গোলমালটা হল সেটা অবিশ্যি খুবই প্যাঁচালো ব্যাপার, আর ফেলুদাকে তার বুদ্ধির শেষ কণাটুকু খরচ করে এই রহস্যের সমাধান করতে হয়েছিল।

আমরা যাত্রা দেখবার দিন দশেক পরেই এক'দিন টেলিফোনে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করে ইন্দ্রনারায়ণবাবু নিজেই আমাদের লালমোহনবাবু যথারীতি নটার মধ্যেই আড়া মারতে চলে এসেছেন, দশটা নাগাত ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। যাকে বলে ক্লিন শোভন চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, রং ফরসা। হাইট মাঝারির চেয়ে একটু বেশি, মাথার চুল প্রায় সবই কাঁচা। ফেলুদা প্রথমেই সূর্যতোরণের প্রশংসা করে বলল, আপনি তো মশাই ম্যান অফ মেনি পার্টস, এত রকম শিখলেন। কী করে? ভদ্রলোক হালকা হেসে বললেন, আমার লাইফ হিস্ট্রিটা একটু বেয়াড়া ধরনের। আমার ফ্যামিলির কথা জানলে পরে বুঝবেন যে আমার যাত্রার সঙ্গে কানেকশনটা কত অস্বাভাবিক। আপনি কি বোসপুকুরের আচার্য পরিবারের কথা জানেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ফেলুদা বলল, সে তো অতি নামকরা ফ্যামিলি মশাই। আপনাদেরই এক পূর্বপুরুষ ছিলেন না। কন্দর্পনারায়ণ আচার্য? যিনি বিলেত গিয়ে প্রিন্স দ্বারকানাথের মতো নবাবি মেজাজে থাকতেন?

আপনি ঠিকই বলেছেন, বললেন ইন্দ্রনারায়ণবাবু। কিন্দর্পনারায়ণ ছিলেন আমার ঠাকুরদার বাবা। আঠারো শো পচাত্তরে বিলেত যান। অত্যন্ত শৌখিন লোক ছিলেন। গান-বাজনার শখ ছিল। তাঁর কিনে আনা বেহালাই আমি বাজাই। আমাদের পরিবারে এক আমার মেজো দাদা হরিনারায়ণ ছাড়া গান-বাজনার দিকে আর কেউ যায়নি। সে অবিশ্যি কিছু বাজায়-টাজায় না; তার উচ্চাঙ্গ সংগীতের শখ। সে রেকর্ড আর ক্যাসেট শোনে। যাই হোক, পরিবার যে খানদানি সে তো বুঝতেই পারছেন। আমরা তিন ভাই-আমি, হরিনারায়ণ আর দেবনারায়ণ। আমি ছোট, দেবনারায়ণ বড়। দেব ব্যবসায়ী আর হরি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমাদের বাবা বেঁচে আছেন। নাম কীর্তিনারায়ণ, বয়স উনআশি; উনি ব্যারিস্টার, যদিও এখন আর কোর্ট-কাছারি করার সামর্থ্য নেই। বুঝতেই পারছেন, এই অবস্থায় আমার যাত্রার সঙ্গে যোগটা কত অস্বাভাবিক। কিন্তু আমার ছেলেবেলা থেকেই ওই দিকে শাখা। আই. এ. পাশ করে আর পড়িনি। বেহালা শিখেছি মাস্টার রেখে, গান করতাম, গান লিখতাম খুব কম বয়স থেকেই। বাবাকে সোজাসুজি বলি যে আমি যাত্রায় জয়েন করব। বাবার আবার কেন জানি আমার উপর একটা দুর্বলতা ছিল, তাই আমার আবদারটা মেনে নিলেন। এখন অবিশ্যি আমি আমার অন্য দু ভাইয়ের চেয়ে কম কিছু রোজগার করি না। যাত্রার আর্থিক সচ্ছলতার কথাটা জানেন তো?

তা আর জানি না, বললেন লালমোহনবাবু। হিরো-হিরোইন মাইনে পায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা করে।

আমার নিজের কথাটা নিজেই বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, বললেন ইন্দ্রনারায়ণবাবু, কিন্তু আজি ভারত অপেরার যে এত নাম-ডাক সেটা প্রায়

অনেকটাই আমার জন্য। আমার নাটক, আমার গান, আমার বাজনা-এগুলো ভারত অপেরার বড় অ্যাট্রাকশন, এবং আমার গোলমালটাও এর থেকেই।

কথাটা বলে ভদ্রলোক থামলেন। তার একটা কারণ অবিশ্যি শ্রীনাথ চা এনেছে তাই। ফেলুদা বলল, আপনি কি অন্য দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন। আমাকে বেশি টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা তো অনেক দিন থেকেই চলছে। টাকা জিনিসটাকে তো আর অগ্রাহ্য করা চলে না, তবে ভারত অপেরার সঙ্গে আমি আছি আজি সতেরো বছর ধরে। এরা আমাকে যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করে, আমার গুণের মর্যাদা দেয়। কাজেই এ দল ছেড়ে অন্য দলে যাবার আগে অনেকবার ভাবতে হয়। আমি তাই এদের সবাইকে ঠেকিয়ে রেখেছি। কিন্তু সেদিন যেটা হল এবং যেটার জন্য আমি আপনার কাছে আসতে বাধ্য হলাম।–সেটা হল আমাকে হটিয়ে ভারত অপেরাকে পঙ্গু করার চেষ্টা।

হটিয়ে মানে?

সোজা কথায় খুন করে।

এটার প্রমাণ কী?

প্রমাণ একেবারে শারীরিক আক্রমণ। তিন দিন আগের ঘটনা। এখনও কাঁধে ব্যথা রয়েছে।

কোথায় হল আক্রমণটা?

বিডন স্ট্রিট থেকে বেরিয়েছে মহম্মদ শফি লেন। সেখানে একটা বাড়িতে আমাদের আপিস আর রিহাসালের ঘর। গলিটো অন্ধকার এবং নিরিবিলি। সেদিন আবার ছিল লোডশেডিং। ডিসি অফ। আমি যাচ্ছি। আপিসে, এমন সময় পিছন থেকে এসে মারাল রড জাতীয় একটা কিছু দিয়ে। মাথায় মারতে চেয়েছিল বোধহয়; অল্পের জন্য পারেনি। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেইসময় আমাদের দলের

দুজন অভিনেতা আসছিল গলি দিয়ে আপিসেই। আমি তখন মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি। তারা আমাকে তুলে আপিসে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে। আমার হাতে বাক্সে বেহালা ছিল, সেটা পড়ে যায় রাস্তায়। আমার সবচেয়ে ভয় ছিল সেটার বুঝি কোনও ক্ষতি হয়েছে–কিন্তু দেখলাম তা হয়নি! এখন, আমি আপনার কাছে এসেছি আমার কী করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ নিতে।

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, এই অবস্থায় তো আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। আর যে লোক আপনাকে আক্রমণ করেছে সে যে বিরুদ্ধ পার্টির লোক এমনও ভাবার কোনও কারণ দেখছি না। সে সাধারণ চোর ছ্যাঁচড় হতে পারে।–হয়তো আপনার মানিব্যাগ হাতানোর তালে ছিল। আপনি বরং পুলিশে খবর দিতে পারেন। এর বেশি আর আমার দিকে থেকে কিছু বলা সম্ভব নয়, মিঃ আচার্য। তবে আর যদি কোনও ঘটনা ঘটে তা হলে আপনি আমাকে জানাবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশ আপনাকে আরও বেশি সাহায্য করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এটুকু বলতে পারি যে আপনার পরিবারিক ইতিহাস আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগল। এ রকম পরিবার থেকে কেউ কোনওদিন যাত্রায় যোগ দিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আমাকে বলা হত আচার্য ফ্যামিলির ব্ল্যাক শিপ, বললেন ইন্দ্রনারায়ণবাবু, অন্তত আমার ভাইরা তাই বলতেন।

ইন্দ্রনারায়ণবাবু আর বসলেন না। উনি চলে যাবার পর ফেলুদা দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, ভাবতে অবাক লাগে যে মাত্র একশো বছর আগে এই আচার্য ফ্যামিলির কন্দর্পনারায়ণ বিলেত গিয়ে চুটিয়ে নবাবি করেছে, আর আজ সেই ফ্যামিলিরই ছেলে মহম্মদ শফি লেনে যাত্রার রিহার্সাল দিতে গিয়ে গুণ্ডার হাতে ব্লডের বাড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিন জেনারেশনে এই পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না।

অবিশ্যি পরিবর্তনটা হয়েছে শুধু এরই ক্ষেত্রে, বললেন লালমোহনবাবু। অন্য ভাইদের কথা যা শুনলুম তাতে তো মনে হয় তাঁরা দিব্যি আচার্য ফ্যামিলির ট্র্যাডিশন চালিয়ে যাচ্ছেন। যাই হোক, বলল ফেলুদা, ফ্যামিলিটাকে ইন্টারেস্টিং লাগছে! বোসপুকুরে একবার গিয়ে পড়তে পারলে মন্দ হত না।

সেই বোসপুকুরের আচার্য বাড়িতে যাবার সুযোগ যে কয়েক'দিনের মধ্যেই এসে পড়বে তা কে জানত?

২

ইন্দ্রনারায়ণের কথা

সম্রাট অশোক আর দুদিনে শেষ হয়ে যাবে। সেদিক দিয়ে ইন্দ্রনারায়ণের চিন্তা করার কিছু নেই। সত্যি বলতে কী, নাটক আরও চারখানা আগেই তৈরি হয়ে আছে, যদিও সে কথা ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর যাত্রা দলের মালিককে এখনও বলেননি। সব নাটক সব সময় চলে না; দর্শকের রুচি আশ্চর্যরকম বদলায় বছরে বছরে। হাওয়া বুঝে নাটক লিখতে হয়, না হলে ভাল নাটকও অনেক সময় মার খেয়ে যায়। সে বিচারে সম্রাট অশোক এখন খুবই যুগোপযোগী নাটক।

আসলে দুশ্চিন্তার কারণ অন্য। এখন বেজেছে রাত দশটা। আর কিছুক্ষণ পরেই বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার অশ্বিনী ভিড় আসবেন ইন্দ্রনারায়ণের কাছে। এই নিয়ে পাঁচবার হবে তাঁর আসা। এ ছাড়া নব নাট্ট কোম্পানির লোকও এসেছে তাঁর কাছে; কিন্তু বীণাপাণির মতো জোর তাদের নেই। আসার কারণ একটাই, ভারত অপেরা থেকে ভাঙিয়ে নিতে চায় তারা ইন্দ্রনারায়ণকে। সতেরো বছর যাত্রার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ইন্দ্রনারায়ণ। এখন তাঁর বয়স বেয়াল্লিশ। এই খাওয়া-খাওয়ির ব্যাপারটা সম্পর্কে এতদিন তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না; এখন হয়েছেন। অবিশ্যি এর জন্য তাঁর খ্যাতিই দায়ী। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ। তাই আজি সব দল তাঁকে হাত করতে চায়। বিশেষ করে বীণাপাণি অপেরা।

সেদিনের আক্রমণটা অবিশ্যি এই রেষারেষির সঙ্গে যুক্ত নাও হতে পারে। প্রদোষিবাবু ঠিকই বলেছিলেন। এটা খুব সম্ভবত চার-ছাঁচড়ের ব্যাপার। মাথায় বাড়ি মারতে চাইলে কি মারতে পারত না? আসলে সে উদ্দেশ্য ছিল না; ছিল

অজ্ঞান করে পকেট থেকে মানিব্যাগটি নিয়ে পালানো। সেদিন সঙ্গে টাকাও ছিল দেড়শোর উপর। ভাগ্যিস মলয় আর ইন্দ্রজিৎ এসে পড়ল! খুব বাঁচন বেঁচেছেন ইন্দ্রনারায়ণ।

সন্তোষ বেয়ারা এসে স্লিপ দিল। অশ্বিনী ভড়।

যাও, ডেকে আনো, বললেন ইন্দ্রনারাণ আচার্য।

অশ্বিনী ভড় এসে চেয়ার টেনে নিয়ে পাশেই বসে বললেন, বলুন।

আপনি বলুন, বললেন ইন্দ্রনারায়ণ।

আমি আর নতুন কথা কী বলব। ইন্দ্রবাবু। আমি তো এই নিয়ে পাঁচবার এলুম। এবার তো একটা এসপার ওসপার না করলেই নয়।

সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমি যে মনস্থির করে উঠতে পারছি না। অশ্বিনীবাবু। এতদিনের একটা সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া তো মুখের কথা নয়।

সবই বুঝলুম, কিন্তু আর্টিস্টরা তো ঘর বদল করছে। নিউ অপেরায় দশ বছর থাকার পর ভারতে চলে গেলেন সঞ্জয়কুমার। এ তো হামেশাই হচ্ছে। আর টাকার অঙ্কটা অগ্রাহ্য করছেন কী করে? আপনি কত পাচ্ছেন ভারত অপেরায় সে তো আমরা জানি। পনেরো হাজার। আমরা সেখানে বলছি বিশ। এক বছরে আপনার ইনকাম হবে। আড়াই লাখ। আর খাতির যত্ন আপনাকে আমরা ওদের চেয়ে কিছু কম করব না। গুণের কদর আমরাও করি। বিজ্ঞাপনে আপনার নাম থাকবে মোটা হরফে। আপনি যা বলবেন তাই আমরা মেনে নেব।–নেহাত যদি সাধ্যের বাইরে না হয়?

শুনুন অশ্বিনীবাবু! আমার আর দু-তিনদিন লাগবে এই নাটকটা শেষ করতে। আমি এখন আর কিছু ভাবতে পারছি না। আপনি সামনের সপ্তাহে আর একটিবার আসুন।

ভরসা দিচ্ছেন কিছুটা?

একেবারে নিরাশ করার ইচ্ছে থাকলে আর আপনাকে আসতে বলব কেন? তবে আমার দিকটাও আপনার চিন্তা করে দেখতে হবে। টাকাটাই যে সব সময় সব থেকে বড় জিনিস তা তো নয়। ভারত অপেরা যদি জানে যে আপনারা আমাকে বিশ অফার করছেন, তা হলে আমার বিশ্বাস তারাও আমাকে ওই টাকাই দিতে চাইবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—এত বছরের সম্পর্ক কি চট করে ভোলা যায়?

ঠিক আছে। তা হলে তো এখন আর কথা বলে লাভ নেই। দিন সাতেক পরে এলে আশা করি ফল হবে। এভাবে ঝুলিয়ে রাখাটাও কোনও কাজের কথা নয়, ইন্দ্রবাবু! আসি। নমস্কার।

নমস্কার।

ইন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের দরজার দিকে কিছুদূর এগিয়ে দিলেন। অশ্বিনীবাবুকে। তারপর নিজের কাজের ঘরে ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলেন। শেষ দৃশ্যটা ভালই যাচ্ছে। এভাবে একেবারে শেষ পর্যন্ত গেলে এ নাটককে কেউ রুখতে পারবে না। এটা হবে ইন্দ্রনারায়ণ আচার্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।

ইন্দ্রনারায়ণ এক মনে কাজ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে দু-একটা শ্যামা পোকা আসছে। সামনে পুজে। এই পোকাই তাঁর কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে। আর লোডশেডিং। তবে আজ ক'দিন থেকে লোডশেডিং হচ্ছে না!! আশা করি সামনের দুটো দিনও হবে না।

ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর পুরো মনোযোগটা লেখায় দিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ নাটক। সম্রাট অশোক।

কিন্তু কাজ বেশি দূর এগোতে পারল না। ইন্দ্রনারায়ণ টেরও পেলেন না যে একটি লোক ঘরে ঢুকে অতি সন্তর্পণে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তারপর হামানদিস্তার একটি মোক্ষম বাড়ি। আর ইন্দ্রনারায়ণের চোখের সামনে সব কিছু চিরতরে অন্ধকার হয়ে গেল!

৩

খবরের কাগজ খুলে চমকে উঠলাম।

ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য তাঁর বাড়িতে খুন হয়েছেন। গত পরশু রাত্রে হয়েছে ঘটনাটা। খবরে যাত্রায় ইন্দ্রনারায়ণের ভূমিকা সম্বন্ধেও কয়েক লাইন লিখেছে। আশ্চর্য দশ দিনও হয়নি ভদ্রলোক আমাদের বাড়ি এসেছিলেন ফেলুদার সঙ্গে দেখা করতে।

ফেলুদা অবিশ্যি আমার আগেই খবরটা পড়েছে। আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, লোকটা এল আমার কাছে, অথচ কিছু করতে পারলাম না। ওর জন্য। অবিশ্যি করার কোনও উপায়ও ছিল না।

আমার একটা ব্যাপারে খটকা লাগছিল। বললাম, প্রথমবার ভদ্রলোককে গলিতে অ্যাটাক করেছিল, আর এবার একেবারে বাড়ির ভিতর এসে খুন করল। খুব ডেয়ারিং খুনি বলতে হবে।

ফেলুদা বলল, সেটা ওঁর বাড়ির প্ল্যান, ভদ্রলোক কোন ঘরে থাকতেন, ইত্যাদি না দেখে বলা যাবে না। আর খুন করার তেমন তাগিদ থাকলে বাড়িতে এসে করবে না কেন?

কিন্তু এবার তো আর তোমাকে তদন্তর জন্য ডাকল না।

এবারে পুলিশকেই ডেকেছে বোঝা যাচ্ছে। তবে ও পাড়ার থানার দরোগা মণিলাল পোদারকে তো বেশ ভাল করে চিনি। এক তিনি যদি কোনও খবর দেন।

মণিলাল পোদ্দারকে আমিও একবার দেখেছি। মোটাসোটা গুফো ভদ্রলোক, ফেলুদাকে যেমন ঠাট্টাও করেন তেমনি শ্রদ্ধাও করেন।

তবে শেষ পর্যন্ত খবরটা এল দারোগার কাছ থেকে নয়; স্বয়ং আচার্য বাড়ির কর্তা উনআশি বছরের বুড়ো কীর্তিনারায়ণ ফেলুদাকে ডেকে পাঠালেন।

খুনটা হবার তিন দিন পরে সকালে নটা নাগাত এক ভদ্রলোক এলেন আমাদের বাড়িতে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বেশ শার্প চেহারা, চোখে সোনার চশমা। অক্টোবর মাস হলেও বেশ গরম, ভদ্রলোক সোফায় বসে রুমাল বার করে ঘাম মুছে বললেন, কিছু মনে করবেন না, মিঃ মিত্তির; বহুবার চেষ্টা করেও আপনার লাইন পেলাম না। আমি আসছি বোসপুকুরের আচার্য বাড়ি থেকে। আমায় পাঠিয়েছেন বাড়ির কর্তা কীর্তিনারায়ণবাবু! আমাদের বাড়িতে একটা খুন হয়েছে জানেন বোধহয়। সেই ব্যাপারে যদি আপনার সাহায্য পাওয়া যায়।

আপনার পরিচয়টা...?

এই দেখুন, আসল কথাটাই বলা হয়নি। আমার নাম প্রদ্যুম্ন মল্লিক। আমি ও বাড়িতে থেকে বংশের আদিপুরুষ কন্দর্পনারায়ণের একটা জীবনী লিখছি। লেখাই আমার পেশা। একটা খবরের কাগজে চাকরি করতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি। আপাতত জীবনীর জন্য তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তিনারায়ণের সেক্রেটারির কাজ করছি। উনি ব্যারিস্টার ছিলেন; রিটায়ার করেছেন বছর চারেক হল। ওঁর শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।

আমাকে ডাকতে এসেছেন—পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি?

পুলিশ যা করার করছে, কিন্তু কীর্তিনারায়ণের পছন্দ-অপছন্দ একটু গতানুগতিকের বাইরে। পুলিশকে ডেকেছে। ওঁর ছেলেরা। উনি নিজে আপনার কথা বললেন। বললেন পুলিশের চেয়ে একজন ভাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করলে কাজ হবে বেশি। উনি আবার গোয়েন্দা কাহিনীর বিশেষ ভক্ত। আপনার যা পারিশ্রমিক তাও উনি দিতে রাজি আছেন। অবশ্যই।

ইতিমধ্যে খুন সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য পাওয়া গেছে?

বিশেষ কিছুই না। খুনটা মাথার পিছন দিকে বাড়ি মেরে করা হয়। ইন্দ্রনারায়ণ তখন টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। পুলিশের ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন যে খুনটা হয় রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে। ইন্দ্রনারায়ণের

ঘর ছিল বাড়ির এক তলায়। একটা শোবার ঘর আর তার পাশে একটা কাজের ঘর। উনি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। উনি যে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে খবর জানেন বোধহয়?

ফেলুদা এবার মিঃ মল্লিককে বলে দিল যে ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য তার কাছে এসেছিলেন, তাই আচার্য পরিবার সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সে জানে।

কাছে বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার আসেন দেখা করতে। পুলিশ অবিশ্যি তাঁকে জেরা করছে, কারণ বাড়ির চাকর সন্তোষ বেয়ারা তার জবানিতে বলে যে, ইন্দ্রনারায়ণ আর ওই ভদ্রলোকের মধ্যে বাচসা হচ্ছিল সেটা সে শুনতে পায়। কিন্তু বীণাপানি অপেরার ভদ্রলোক——নাম বোধহয় অশ্বিনীবাবু—এগারোরটার মধ্যে চলে যান। তারপর আবার আসেন। কি না জানা যায়নি, কারণ বাড়ির পিছন দিকে একটা দরজা আছে সেটা চাকরীরা বন্ধ করে অনেক রাত্রে। রাতের কাজের পর চাকরাগুলো পাড়ায় আড়া দিতে বেরোয়, ফেরে একটার কাছাকাছি। কাজেই বারোটা নাগাত যদি আশ্বিনীবাবু আবার ফিরে এসে থাকেন তা হলে সে খবর কেউ নাও জানতে পারে। যাই হাক, সে তো আপনি গিয়ে তদন্ত করবেনই। অবিশ্যি যদি আপনি তদন্তের ভার নিতে রাজি থাকেন। যদি তাই হয় তা হলে আজ সকালেই এগারোটা নাগাত আপনি আসতে পারেন। তখন কীর্তিনারায়ণ ফ্রি থাকেন।

ফেলুদ রাজি হবে জানতাম, কারণ আচার্য পরিবার সম্বন্ধে ওর একটা কৌতুহল আগে থেকেই ছিল। তা ছাড়া ইন্দ্রনারায়ণবাবুর সঙ্গে কথা বলেও ওর বেশ ভাল লেগেছিল। ঠিক হল আমরা এগারোটার সময় বোসপুকুরে গিয়ে হাজির হব। প্রদ্যুন্নবাবু আরেকবার ঘাম মুছে বিদায় নিলেন।

ওই কাগজটা কী বেরিয়ে পড়ল দেখ তো, ফেলুদা বলল ভদ্রলোক চলে যাবার পর। একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ সোফার কোণে পড়ে আছে, আমি

সেটা তুলে ফেলুদাকে দিলাম। ভাঁজ খুলতে দেখা গেল ডট পেনে দুলাইন ইংরিজি লেখা—

HAPPY BRTHDAY

HUKUM CHAND

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে বলল, হুকুম চাঁদ নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কথাটা বোধহয় জন্মদিনের কেকের উপর লেখা হবে। হুকুম চাঁদ সম্ভবত কীর্ত্যিনারায়ণের বন্ধু! কিম্বা হয়তো টেলিগ্রাম পাঠানো হবে; মল্লিকের উপর ভার ছিল কাজটা করবার।

ফেলুদা কাগজটাকে আবার ভাঁজ করে নিজের শার্টের বুক পকেটে রেখে দিল।

এবার কর্তব্য হচ্ছে তৃতীয় মাস্কেটিয়ারকে ফোন করা। তাঁর যান ছাড়া তো আমাদের গতি নেই, এবং তাঁকে বাদ দিলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন বলে মনে হয় না।

লালমোহনবাবুকে ফোন করার এক ঘণ্টার মধ্যেই ভদ্রলোক স্নান করে ফিটফট হয়ে নিজের সবুজ অ্যাম্বাসাডর নিয়ে চলে এলেন। সব শুনেন্টুনে বললেন, এবারে পুজোটা তার মানে রহস্যের জট ছাড়াতেই কেটে যাবে। তা এক হিসেবে ভাল। উপন্যাসটা লেখা হয়ে গেলে পর হাতটা বড় খালি খালি লাগে। এতে সময়টা দিব্যি কেটে যাবে। ভাল কথা, আমার পড়শি রোহিণীবাবু সেদিন বলছিলেন ওঁর নাকি বোসপুকুরে আচার্যদের সঙ্গে চেনা শুনা আছে। বললেন, এমন পরিবার দেখবেন না মশাই; বাপ-ছেলেীয় মিল নেই, ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল নেই, তাও একান্নবর্তী হয়ে বসে আছে। সে বাড়িতে যে খুন হবে সেটা আশ্চর্যের কিছুই নয়।

আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু যে গাড়িটার যত্ন নেন। সেটা গাড়ির কন্ডিশন দেখলেই বোঝা যায়। ভদ্রলোক ফেলুদার ভীষণ ভক্ত।

এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে বোসপুকুর রোড়ে আচার্যদের বাড়ির পোর্টিকোর নীচে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আমাদের অ্যাম্বাসডর। কলিং বেল টিপতে চাকর এসে দরজা খুলে দিতেই দেখি পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রদ্যুম্ন মল্লিক। বললেন, গাড়ির আওয়াজ শুনেই বুঝেছি আপনি এসেছেন। আমিও থাকি একতলাতেই। আসুন দোতলায় একেবারে বড় কর্তার কাছে।

পেল্লায় বাড়ি, নিশ্চয়ই সেই কন্দর্পনারায়ণের তৈরি, কিম্বা তারও আগে হতে পারে, কারণ দেখে মনে হয়। বয়স হবে অন্তত দেড়শো বছর। চওড়া কাঠের সিঁড়িতে শব্দ তুলে আমরা দোতলায় গিয়ে পৌঁছলাম। সিঁড়ির পাশের দেয়ালে আচার্যদের পূর্বপুরুষদের বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে একটা প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের মূর্তি, এদিকে ওদিকে ছড়ানো নানান সাইজের ফুলদানি তার বেশির ভাগই চিনে বলে মনে হল! একটা বিশাল দাঁড়ানো ঘড়িও রয়েছে সিঁড়ির সামনের বারান্দায়। বারান্দার এক পাশে দাঁড়ালে নীচে নাটমন্দির দেখা যায়, অন্য পাশে সারবাঁধা ঘর। এরই একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে ঢোকালেন প্রদ্যুম্ন মল্লিক। দেখলাম এটা একটা মাঝারি সাইজের বৈঠকখানা; চারিদিকে সোফা বিছানো, মাটিতে কার্পেট, মাথার উপর দুদিকে দুটো ঝাড় লণ্ঠন। আমি আর লালমোহনবাবু একটা সোফায় বসলাম। ফেলুদা কিছুক্ষণ পায়চারি করে জিনিসপত্র দেখা আর একটা ছোট সোফায় বসল। মল্লিক। মশাই গেছেন কীর্তিনারায়ণকে ডাকতে।

দু মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লেন বাড়ির কর্তা কীর্তিনারায়ণ আচার্য। ধপধাপে ফরসা রং, দাড়ি গোঁফ কামানো, চুল অধিকাংশই পাকা। তবে উনআশিতেও যে কিছু কাঁচা অবশিষ্ট রয়েছে সেটাই আশ্চর্য। ছোটখাটা মানুষ

কিন্তু এমন একটা পার্সোনালিটি আছে যে তাঁর দিকে চোখ যাবেই, এবং গিয়ে থেমে থাকবে। দেখে মনে হয় ব্যারিস্টার হিসেবে ইনি নিশ্চয়ই খুব পাকা ছিলেন। ভদ্রলোকের পরনে সিল্কের পায়জামা, পাঞ্জাবি আর বেগুনি রঙের ড্রেসিং গাউন। চোখে যে চশমাটা রয়েছে সেটা হল যাকে বলে হাফ গ্লাস, অর্থাৎ নীচের দিকে পড়ার জন্য অর্ধেক লেন্স আর উপর দিকটা ফাঁকা।

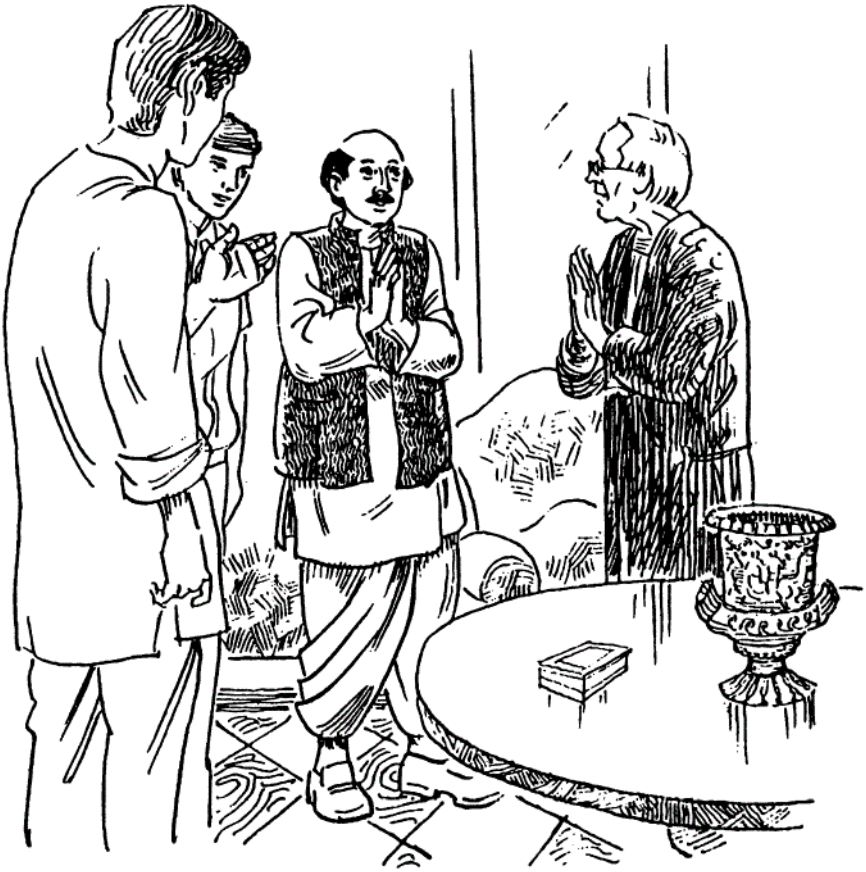

কই, কিনি গোয়েন্দা মশাই?

ফেলুদা নিজের, এবং সেই সঙ্গে আমাদের দুজনের পরিচয় দিয়ে দিল। লালমোহনবাবুর পরিচয় পেয়ে কীর্ত্তিনারায়ণ চোখ কপালে তুললেন। কই, আপনার লেখা কোনও রহস্য গল্প তো কোনওদিন পড়িনি!

লালমোহনবাবু ভীষণ বিনয় করে বললেন, আজ্ঞে সে সব আপনার পড়ার মতো কিছুই না। তবু, রহস্য গল্প যখন লেখেন তখন আপনার মধ্যেও একটি গোয়েন্দা নিশ্চয়ই বর্তমান। দেখুন, আপনারা দুজনে মিলে এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারেন। কিনা। ইন্দ্র ছিল আমার ছোট ছেলে। যা হয়, কনিষ্ঠ সন্তান অনেক সময়ই একটু নেগলেকটেড হয়। ওর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য ও কোনওদিন অভিযোগ করেনি বা কুপথে যায়নি। গান-বাজনা ভালবাসত, পড়াশুনা যখন হল না। তখন ভাবলুম ওদিকেই যাক। ছোট বয়স থেকেই গান লিখত, নাটক লিখত, বেহালা বাজাত। বাড়িতে বেহালা ছিল ঠাকুরদাদার আনা বিলেত থেকে, আম আটির ভেঁপু—

আম আঁটির ভেঁপু? ফেলুদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

ওই রকমই রসিকতা ছিল ঠাকুরদার, বললেন কীর্ত্তিনারায়ণ, বেহালাকে বলতেন। আম আঁটির ভেঁপু, প্রথম ল্যাগন্ডা মোটর গাড়ি যখন কিনলেন তখন সেটাকে বলতেন পুষ্পক রথ, গ্রামোফোন রেকর্ডকে বলতেন। সুদর্শন চক্র—এই আর কী। ঠাকুরদাদার কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে কী, ইন্দ্রর এই ভাবে জীবন শেষ হয়ে যাওয়াতে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি। যাত্রায় যোগ দেওয়াটা আচার্য বাড়ির ছেলের পক্ষে কিছু গৌরবের নয় ঠিকই, কিন্তু শেষের দিকে সে মাইনে পেত পনেরো হাজার টাকা; এটাও তো দেখতে হবে! তার মধ্যে গুণ না থাকলে এটা কি হয়? আমি নিজে যাত্রা থিয়েটারের খুব ভক্ত ছিলাম। এক রকম নেশা ছিল বলতে পার। সেখানে আমার নিজের ছেলে সে লাইনে গেলে নাক সিটিকোলে চলবে কেন? না, ইন্দ্রকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। আর সে সেটার সদ্ব্যবহার করে পুরোপুরি। যাত্রার

কাজ করেও তার মধ্যে কোনও বদ খেয়াল দেখা দেয়নি। কাজ-পাগলা মানুষ ছিল সে। বেহালায় হাত ছিল চমৎকার, গান লিখিত রীতিমতো ভাল। আমার মতে আচার্য বংশের সে কোনও রকম অসম্মান করেনি; বরং একদিক দিয়ে দেখলে মুখ উজ্জ্বলই করেছে।

ফেলুদা বলল, আপনি কি জানেন যে দিন পনেরো আগে মহম্মদ শফি লেনে তাঁকে একজন এসে পিছন থেকে আঘাত করে, এবং সে আঘাত কাঁধে না পড়ে মাথায় পড়লে তিনি হয়তো তখনই মারা যেতেন?

তা জানি বইকী, বললেন কীর্তিনারায়ণ।আমিই তো তাকে তোমার পরামর্শ নিতে বলি।

এবার যে ঘটনাটা ঘটিল, আপনার মতে কি তার জন্যও এই যাত্রার দলগুলির মধ্যে রেষারেষিই দায়ী?

সে তো আমি বলতে পারব না। সেটা বার করার দায়িত্ব তোমার। তবে এটা বলতে পারি যে ইন্দ্রর শত্রু যদি থেকে থাকে তো সে যাত্রার দলেই হয়তো থাকবে? এমনিতে সে বিশেষ কারুর সঙ্গে মিশত না, আর সম্পূর্ণ নির্বিবাদী লোক ছিল। বললাম না, সে যে জিনিসটা জানত সেটা হল কাজ। কাজের বাইরে তার আর কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না।

পুলিশ তো বোধহয় বাড়ির সকলকে জেরা করেছে?

তা তো করবেই। সেটা তো তাদের রুটিনের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তারা করেছে বলে তুমি করতে পারবে না। এমন কোনও কথা নেই। এখন অবিশ্যি তুমি আমার অন্য ছেলেদের পাবে না! সন্ধ্যায় এলে পাবে। প্রদ্যুম্ন এখন আছে, তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে করতে পারো। চাকর-কেয়ারারা আছে। আমার এক বউমা আছেন, হরিনারায়ণের স্ত্রী। বড় ছেলে দেবনারায়ণ বিপত্নীক। হরিনারায়ণের মেয়ে লীনা আছে। সে খুব চালাক-চতুর। ইন্দ্রর খুব ন্যাওটা ছিল। ভাল কথা, তোমার ফি কত?

আমি আগাম হাজার টাকা নিই, তারপর তদন্ত ঠিক মতো শেষ হলে পর আরও হাজার নিই।

রহস্যের সমাধান না হলে আগামটা ফেরত দেওয়া হয়?

আজ্ঞে না, তা হয় না।

ভেরি গুড। আমি তোমাকে হাজার টাকার চেক লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দোহাই বাপু-আমি কোনদিন ফস করে চলে যাব-একে ডায়বেটিস, তার উপর একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে -যাবার আগে ইন্দ্রের খুনির শাস্তি হয় এটা আমি দেখে যেতে চাই।

শুধু একটা প্রশ্ন করার বাকি আছে।

বলো।

হুকুম চাঁদ বলে কি আপনার বন্ধুস্থানীয় কেউ আছে?

হুকুম সিং বলে একজনকে চিনতাম, তা সে অনেক'দিন আগে।

থ্যাঙ্ক ইউ।

ফেলুদা প্রদ্যুম্নবাবুর সঙ্গেই আগে কথা বলা স্থির করল। কীর্তিনারায়ণবাবু উঠে চলে যেতেই প্রদ্যুন্নবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক প্রথম কথাই বললেন, দারোগা সাহেব একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!

কে, মিস্টার পোদ্দার?

হ্যাঁ, উনি নীচে আছেন।

আমরা তিনজন নীচে রওনা দিলাম। লালমোহনবাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, তবে বুঝতে পারছিলাম যে উনি সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। বিভিন্ন লোকে কী ভাবে কথা বলে। সেদিকে নাকি লেখকদের দৃষ্টি রাখতে হয়, তা না হলে গল্পে ভাল ডায়ালগ লেখা যায় না। তা ছাড়া কিছুদিন আগেই লালমোহনবাবু এক'দিন আমাদের বাড়িতে আড্ডা মারতে মারতে বলেছিলেন, শোনো ভাই তপেশী, তোমার দাদাকে কিন্তু আমরা তদন্তের ব্যাপারে যতটা

সাহায্য করতে পারি ততটা করি না। এবার থেকে আমরাও চোখ-কান খোলা রাখব। শুধু দর্শকের ভূমিকা নেওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়-বিশেষ করে আমি নিজেই যখন গোয়েন্দা কাহিনী লিখি!

মণিলাল পোদ্দার ফেলুদাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, গন্ধে গন্ধে ঠিক এসে হাজির হয়েছেন দেখছি।

ফেলুদা বলল, আমি তো ভাবলাম এসে দেখব। আপনি বুঝি কেস খতম করে ফেলেছেন।

ব্যাপারটা তো মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছে, বললেন মণিলালবাবু, যাত্রা পার্টিদের মধ্যে রেষারেষি। ভিকটিম ভারত অপেরার স্তম্ভ বিশেষ, ওঁর জোরেই প্রায় নাটক চলত, অন্য দল তাঁকে ভাঙিয়ে নিতে চেষ্টা করছিল, পারেনি, তাই তাঁকে খুন করে ভারত অপেরাকে খোঁড়া করে দিয়েছে। অবিশ্যি চুরিরও একটা মোটিভ ছিল, কারণ ঘরে কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছিল। হয়তো ওঁর লেখা কোনও নতুন নাটক খুঁজছিল।

আপনি ভারত অপেরার মালিকের সঙ্গে কথা বলেছেন?

শুধু ভারত অপেরা কেন? যেদিন খুনটা হয় সেদিন রাইভ্যাল কোম্পানি বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার এসেছিলেন ভিকটিমের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোকের নাম অশ্বিনী ভড়। অনেক প্রলোভন দেখান। বিশ হাজার টাকা মাইনে আফার করেন; কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ কোনও কমিটি করেননি। ভারত অপেরার প্রতি ন্যাচারেলি ওঁর একটা লায়েলটি ছিল। অশ্বিনী ভিড় চলে যান। পীনে এগারোটায়। খুনটা হয় বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে। বাড়ির পিছনের দরজা খোলা ছিল। চাকর বলে ইন্দ্রনারায়ণ তখনও কাজ করছিলেন, আর মাঝে মাঝে বেহাল বাজাচ্ছিলেন। হয়তো গান লিখছিলেন। সেই সময় মার্ডারটা হয়। পিছন দিক থেকে এসে কোনও ভোঁতা ভারী অস্ত্র দিয়ে মাথায় মারে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু! টেবিলে ঝুকে কাজ করছিলেন, এমনিতেই মারার সুবিধে।

অস্ত্রটা পাওয়া গেছে?

না। যেদিকটা ইন্দ্রনারায়ণ থাকতেন সেদিকটা নিরিবিলি। এক তলার ঘর। চাকর-বাকর খেয়ে দেয়ে আড়ড়া মারতে গিয়েছিল। খাস বেয়ার! সন্তোষের আবার মদের নেশা, সে খাবার পরে মাল খেতে যায়, সাড়ে বারোটা একটায় এসে পিছনের দরজা বন্ধ করে। সদর দরজা অবিশ্যি সব সময়ই বন্ধ থাকে, আর বাইরে দারোয়ান আছে। বারোটার পর যদি কেউ পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকে তা হলে কেউ টের পাবে না। কারণ বাড়ির পিছনে গলি-যদু নস্কর লেন।

আমি যদি একবার ইন্দ্রনারায়ণের শোবার ঘর আর কাজের ঘরটা দেখি তা হলে আপনাদের আপত্তি নেই তো?

মোটেই না। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তবে আমি যেমন আপনাকে ইনফরমেশন দিলাম, সেটা আপনার তরফ থেকেও পেলে দুপক্ষেরই সুবিধা-বুঝতেই তো পারছেন, হেঁ হেঁ।

৪

মণিলালবাবুর সঙ্গে কথা সেরে আমরা প্রদ্যুম্নবাবুর সঙ্গে গেলাম ইন্দ্রনারায়ণ আচার্যের ঘরে। ঘরটা এক তলার উত্তর-পশ্চিম কোণে। বাড়ির উত্তর দিকটা হচ্ছে সামনের দিক। মাঝখানে নাটমন্দির আর তাকে ঘিরে তিনদিকে বারান্দা আর সারি সারি ঘর। বাড়ির পিছনের দরজাটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, পশ্চিমের বারান্দার শেষ মাথায়। তার মানে কেউ দরজা দিয়ে ঢুকে বারান্দা পেরোলেই ইন্দ্রনারায়ণবাবুর শোবার ঘর পাবে সামনে। তারপর উত্তরের বারীন্দী ধরে দশ পা গেলে ডাইনে পাবে ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাজের ঘরের দরজা। অর্থাৎ বাইরে থেকে একজন লোক এসে খুন করাটা খুবই সহজ ব্যাপার।

শোকার ঘরে খাট, একটা আলমারি, দুটো তাক আর কিছু ট্রাঙ্ক সুটকেস ছাড়া জিনিস বেশি নেই। আমরা কাজের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

এখানে বড় বড় দুটো তাক বোঝাই কাগজপত্র খাতা ইত্যাদিতে। বুঝলাম। এগুলোতে নাটক আর গানের খসড়া রয়েছে। সতেরো বছরের যত কাগজ সবই মনে হল এই দুটো তাকে রয়েছে! বারান্দার দিকে যে দরজাটা রয়েছে সেটার ঠিক ডান পাশে একটা টেবিল আর চেয়ার। বোঝাই গেল এইখানেই খুনটা হয়েছিল। টেবিলের উপর ফাউনটেন পেন, ডট পেন, পেনসিল, পেপার ওয়েট, কালি, টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি রয়েছে। আর যেটা রয়েছে সেটা হল একটা বেহালার কেস। ফেলুদা বলল, একবার আম আঁটির ভেঁপুর চেহারাটা দেখা যাক।

বাক্স খুলে বেহালাটা দেখে বুঝলাম ইন্দ্রনারায়ণবাবু সেটার খুব যত্ন নিতেন। একশো বছরের পুরনো বেহালা এখনও প্রায় নতুনের মতে রয়েছে।

ফেলুদা কেসটা বন্ধ করে দিল।

এ ছাড়া ঘরে রয়েছে এক পাশে একটা সোফা, একটা চেয়ার আর শ্বেত পাথরের একটা ছোট তেপায়া টেবিল। দেয়ালে ছবির মধ্যে রয়েছে দুটো বাঁধানো মানপত্র—ইন্দ্রনারায়ণের পাওয়া-একটা বিলিতি ল্যান্ডস্কেপ আর একটা রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাকামারা ছবি।

ঘর দেখা হলে সোফা আর চেয়ারে ভাগাভাগি করে বসলাম আমরা চারজন প্রদ্যুন্নবাবু ইতিমধ্যে ঘোলের সরকতের জন্য বলেছিলেন, সেটা এনে চকর শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর রাখল। সরবত খেতে খেতে কথা হল।

আপনার ঘরটা কোথায়? ফেলুদা প্রশ্ন করল প্রদ্যুন্নবাবুকে।

টেরচা ভাবে এই ঘরের বিপরীত দিকে, বললেন প্রদ্যুন্নবাবু, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। একেরারে কোণের ঘরটা হল। লাইব্রেরি, আর আমারটা হল তার পাশেই।

আপনি রাত্রে ঘুমোন কখন?

তা বেশ রাত হয়। এক-আধা দিন তো একটা দেড়টাও হয়ে যায়। আমার কাজটা-অর্থাৎ কন্দর্পনারায়ণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটা—আমি সাধারণত রাত্রেই করি। প্রথম দিকে আমার কাজ ছিল কীর্তিনারায়ণকে ইন্টারভিউ করা। তিনি বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর ঠাকুরদাদাকে দেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে সব তথ্য নেওয়া হলে পর আমি চিঠিপত্‌র দলিল ডায়রি ইত্যাদি স্টাডি করা শুরু করি।

তা হলে সেদিন যখন খুনটা হয় তখন আপনি জেগে ছিলেন?

তা তো বটেই। তবে নাটমন্দিরটা এত বড় যে আমার কাজের ঘর থেকে এ ঘরটা দেখাও যায় না, এখানকার কোনও শব্দ শোনাও যায় না।

বীণাপাণি অপেরা থেকে লোক এসেছিল ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাছে সে খবর জানা গেল কী ভাবে?

সেটা বলেছে সন্তোষ বেয়ারা। অশ্বিনী ভিড় যে স্ক্রিপটা পাঠিয়েছিলেন সেটাও টেবিলের উপর পাওয়া যায়। ভদ্রলোক কখন যান। সে খবরও বেয়ারাই দেয়।

আপনি বেহালা শুনতে পাননি?

তা হয়তো এক-আধকার শুনেছি, কিন্তু সেটা প্রায় রোজই শুনতাম বলে বিশেষ করে সেই দিন শুনেছিলাম। কিনা বলতে পারব না।

কনদর্শনারায়ণ কি নিয়মিত ডায়রি লিখতেন?

পরের দিকে লেখেননি, কিন্তু পাঁচিশ বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত লিখেছিলেন।

তার মানে বিলেত ভ্রমণের ডায়ারিও আছে?

আছে বইকী, আর সে এক আশ্চর্য জিনিস। কত লর্ড আর ডিউক আর ব্যারনের সঙ্গে যে তিনি খানাপিনা করেছেন তা পড়লে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। লণ্ডন থেকে কন্দর্পনারায়ণ ফ্রান্সে যান। সেখানে প্যারিসে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি চলে যান। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে দক্ষিণ ফ্রান্সের রিভিয়েরাতে। আপনি তো জানেন এই অঞ্চলের কয়েকটি শহরের ক্যাসিনো হল জুয়াড়িদের তীর্থস্থান! কন্দর্পনারায়ণ মন্টি কালের ক্যাসিনোতে রুলেট থেকে লাখ লাখ টাকা জেতেন। খুব কম বাঙালিই সে যুগে বিলেত গিয়ে এরকম কীর্তি রেখে এসেছেন।

আচার্যদের জমিদারি কোথায় ছিল?

পূর্ববঙ্গে কান্তিপুরে। বিরাট জমিদারি।

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল! দুটো টান দিয়ে তারপর বলল, মৃতদেহ আবিষ্কার করে কে?

সেও সন্তোষ বেয়ারা। সে নিজে ফেরে প্রায় পৌনে একটায়। তারপর ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাজের ঘরে বাতি জ্বলছে দেখে একবার উঁকি দিতে এসে দেখে এই ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেয়। তারপর আমি দোতলায় গিয়ে অন্যদের জানাই।

পুলিশে খবর দেবার সিদ্ধান্ত কার?

দেবনারায়ণবাবুর। বড় কর্তা না করেছিলেন, কিন্তু দেবনারায়ণবাবু বাপের কথায় কান দেননি।

আপনার সঙ্গে ইন্দ্রনারায়ণবাবুর সম্পর্ক কীরকম ছিল?

দিব্যি ভাল। আমি ভদ্রলোককেও কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। বিশেষ করে তাঁর বেহালা সম্পর্কে। উনি বলেন যন্ত্রটা খুব ভাল এবং আওয়াজ অতি মিষ্টি। প্রায় সত্তর বছর। ওটা না বাজানো অবস্থায় পড়ে ছিল, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ ওটা বার করে বাজাতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওটার আওয়াজ খুলে যায়।

ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

একেবারে কাজ-পাগলা মানুষ ছিলেন। কাজে ডুবে থাকতেন যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন। লাইব্রেরি থেকে বই নিতে আসতেন মাঝে মাঝে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নাটক লেখার সময় বই দেখার দরকার হাতই। কন্দর্পনারায়ণের ছেলে, কীর্তিনারায়ণের বাবা দর্শনারায়ণ ইতিহাসে এম. এ. ছিলেন। তাই লাইব্রেরিতে ইতিহাসের বই খুব ভালই আছে।

এবার অন্য দু ভাই সম্বন্ধে একটু জানতে চাই।

বেশ তো।

সবচেয়ে বড় তো দেবনারায়ণ। তারপর হরিনারায়ণ, তারপর ইন্দ্রনারায়ণ!

হ্যাঁ।

ইন্দ্রনারায়ণ তো বিয়েই করেননি। আর দেবনারায়ণ শুনলাম বিপত্নীক?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বছর সাতেক আগে ওঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

ওঁর ছেলেপিলে নেই?

একটি মেয়ে আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী পুনায় কাজ করে। ছেলে একটি আছে সে আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে।

আপনার মতে দেবনারায়ণ লোক কেমন?

অত্যন্ত চাপা, গভীর প্রকৃতির মানুষ।

উনি কি চাকরি করেন?

উনি স্টকওয়েল টি কোম্পানিতে উঁচু পোস্টে আছেন।

অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন কখন?

তা রাত সাড়ে নটার আগে তো নয়ই, কারণ অফিস থেকে ক্লাবে যান। সন্ধ্যাটা সেখানেই কাটান।

ভাইয়ের মৃত্যুতে কি উনি খুব শোক পেয়েছিলেন বলে মনে হয়?

তিন ভাইয়ের মধ্যে বিশেষ সম্ভাব ছিল না। বিশেষ করে ইন্দ্রনারায়ণ যাত্রার কাজ করেন। বলে আমার ধারণা অন্য দুভাই ওঁকে বেশ হেয় জ্ঞান করতেন।

কিন্তু কীর্তিনারায়ণ তো ছোট ছেলেকে বেশ ভালই বাসতেন।

শুধু ভালবাসতেন না, তিন ছেলের মধ্যে ছোটকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। এ-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই, কারণ অনেক কথাতেই এই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেত।

কীর্তিনারায়ণ কি উইল করেছেন?

করেছেন বলেই তো আমার ধারণা।

সেই উইলেও তো এই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে।

তা তো পারেই।

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল। লালমোহনবাবু তাঁর ছোট্ট লাল খাতাটা বার করে কী যে নোট লিখছেন তা উনি জানেন! হয়তো ভবিষ্যতের একটা গল্পের প্লট ওঁর মাথায় আসছে।

এবার দ্বিতীয় ভাই সম্বন্ধে একটু জানা দরকার।

কী জানতে চান বলুন, বললেন প্রদ্যুম্নবাবু!

উনি তো চাটগার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট?

হ্যাঁ! স্কিনার অ্যান্ড হার্ডউইক কোম্পানিতে আছেন।

কেমন লোক?

ওঁর তো ফ্যামিলি আছে, কাজেই সেখানেই বড় ভাইয়ের সঙ্গে একটা তফাত হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক মোটামুটি ফুর্তিবাজ, বিলিতি গান বাজনার খুব ভক্ত।

রেকর্ড আর ক্যাসেট শোনেন?

হ্যাঁ, তবে সেটা রবিবারে। অন্যদিন সন্ধ্যায় ইনিও ক্লাবে যান, ফেরেন সেই সাড়ে নটা দশটায়।

কোন ক্লাব?

স্যাটারডে ক্লাব।

বড় ভাইও কি একই ক্লাবের মেম্বার নাকি?

না, উনি বেঙ্গল ক্লাবে।

হরিনারায়ণের তো একটি মেয়ে আছে।

হ্যাঁ—লীনা। বুদ্ধিমতী। বছর চোদ্দ বয়স, পিয়ানো শিখছে। ক্যালকাটা গার্লস স্কুলে পড়ে। সে বেচারি কাকার মৃত্যুতে খুব আঘাত পেয়েছে, কারণ সে কাকার খুব ভক্ত ছিল।

আর হরিনারায়ণবাবু? তিনি আঘাত পাননি?

বড় দু ভাইয়ের কেউই ছাটকে বিশেষ আমল দিতেন না।

আর হয়তো ইন্দ্রনারায়ণ যাত্রা থেকে এত রোজগার করছে সেটাও তারা বিশেষ সুনজরে দেখত না।

তাও হতে পারে।

আমার অবিশ্যি এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সেটা বোধহয় শনি কি রবিবার করলে ভাল হয়, তাই না?

শনিবার সকালে এলে দু ভাইকেই পাবেন।

আপনি যে কন্দর্পনারায়ণের জীবনীর উপর কাজ করছেন, সেটা কতদিন থেকে?

তা প্রায় ছমাস হল।

হঠাৎ এই মতি হল কেন?

আমি উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব বলে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনা করছিলাম। সেই সময় কন্দর্পনারায়ণের নাম পাই। খোঁজখবর নিয়ে জানি তাঁর বংশধরেরা এখনও আছেন বোসপুকুরে। সোজা এসে কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে দেখা করি। কীর্তিনারায়ণ বলেন—তুমি আমার বাড়িতে থেকে রিসার্চ করতে পারো, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার কিছু কাজও করে দিতে হবে। তার জন্য আমি তোমাকে পারিশ্রমিক দেব। আমি তখন খবরের কাগজের কাজ ছেড়ে এখানে চলে আসি। এখানে অনেক ঘর খালি পড়ে আছে, তারই একটা ঘরে আমাকে এক তলায় থাকতে দেন কীর্তিনারায়ণ। গত ছমাসে আমি এবাড়ির সঙ্গে বেশ মিশে গেছি। আমার কারবার অবিশ্যি শুধু কীর্তিনারায়ণকে নিয়েই, তবে অন্যরাও আমার ব্যাপারে কোনও আপত্তি করছেন বলে শুনিনি।

ভাল কথা–

ফেলুদা তার পার্স থেকে এক টুকরো সাদা কাগজ বার করল।

এটা বোধহয় সেদিন আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল—আপনি যখন ঘাম রুমাল বার করেন। জন্মদিনের জন্য কেকের অর্ডার কি, নাকি টেলিগ্রাম?

ফেলুদা হ্যাপি বাথর্ডে হুকুম চাঁদ লেখা কাগজটা প্রদ্যুম্নবাবুর হাতে দিল। প্রদ্যুম্নবাবু ভুরু কপালে তুলে বললেন, কই, এমন তো কোনও কাগজ আমার পকেটে ছিল না। আর এই হুকুম চাঁদ যে কে সে তো আমি বুঝতেই পারছি না।

আপনি সেদিন কীসে করে আমার বাড়িতে এসেছিলেন?

বাস।

বাসে ভিড় ছিল? তার মধ্যে কেউ এটা পকেটে ফেলে দিতে পারে?

তা পারে, কিন্তু এটার তো কোনও মানেই আমি বুঝতে পারছি না।

এটা যদি আপনার না হয় তো আমার কাছেই থাকুক।

ফেলুদা কাগজটা আবার পার্সে রেখে দিল। এই কাগজ যে একটা রহস্যের মধ্যে পড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

৫

আমরা বোসপুকুর গিয়েছিলাম বিষ্যুদবার, আবার যেতে হবে শনিবার, কাজেই মাঝে শুকুরবারটা ফাঁক। সেই ফাঁকে দেখি লালমোহনবাবু আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আসলে একটা তদন্ত যখন শুরু হয়ে যায়। তখন আর নিয়ম মানা যায় না।

ভদ্রলোক এসেই ধাপ করে সোফায় বসে বললেন, আপনার তো শুধু বোসপুকুর গেলে চলবে না মশাই-যাত্রা পাটিগুলোতেও তো একবার যাওয়া দরকার।

সে আর বলতে, বলল ফেলুদা।মৃত ব্যক্তির সমস্ত জীবনটাই তো যাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন বাড়িতে বসে না গেজিয়ে চলুন মহম্মদ শফি লেনটা ঘুরে আসা যাক।

তারপর বীণাবাণি অপেরার ম্যানেজার সেই ঈশানবাবু না কি-

আশ্বিনীবাবু! হ্যাঁ। অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে তো কথা বলতে হবে। তাই না?

নিশ্চয়ই। তোপ্‌সে, একবার ডিরেকটরিতে দ্যাখ তো বীণাপাণি অপেরার ঠিকানাটা কী।

ডিরেকটরি দেখতে বেরোল বীণাপাণি অপেরা সুরেশ মল্লিক স্ট্রিটে। লালমোহনবাবু বললেন যে রাস্তাটা ওঁর জানা আছে। ওখানের একটা ব্যায়ামাগারে নাকি উনি কলেজে থাকতে রেগুলারলি যেতেন।

বলেন কী! বলল ফেলুদা।

বিশ্বাস করুন। ডুন বৈঠক বারবেল চেস্ট-এক্সপ্যান্ডার কোনওটা বাদ দিইনি। বডির ডেভেলপমেন্টও হয়েছিল ভালই; আমার হাইটু বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি নেহাত নিন্দের নয়।

তা সে সব মাংসপেশি গেল কোথায়?

আর মশাই, লেখক হলে কি আর মাসল থাকে শরীরে? তখন সব মাসল গিয়ে জমা হয় ব্রেনে। তবে ভোরে হাঁটার অভ্যোসটা রেখেছি। ডেইলি টু মাইলস। তাই তো আপনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারি।

চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবুর খুব উৎসাহ। খুনের ব্যাপারটা কাগজে পড়েছেন, তা ছাড়া ভারত অপেরার অনেক যাত্রা ওঁর দেখা। আমরা সেই খুনেরই তদন্ত করছি জেনে বললেন, ইন্দ্র আচায্যি এক ভারত অপেরাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর খুনিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করতে পারলে একটা কাজের কাজ হবে।

শুক্রবার ট্র্যাফিক প্রচুর, তাই ভারত অপেরার আপিসে পৌঁছতে লাগল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। নম্বরটা ডিরেকটরিতে দেখে নিয়েছিলাম, তা ছাড়া দরজার উপরে সাইন বোর্ডে লেখাই রয়েছে কোম্পানির নাম।

দরজা দিয়ে ঢুকে একটা টেবিলের পিছনে একজন কালো মতন মাঝবয়সী লোক বসে আছেন; বললেন, কাকে চাই?

ফেলুদা তার কার্ডটা বার করে দেখাতে ভদ্রলোকের চোখের অলস চাহনিতে কিছুটা জৌলুস এল। বললেন, আপনারা কি শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন—আমাদের প্রোপাইটার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলল ফেলুদা।একটু বসুন। একটা বেঞ্চি আর আরও একটা চেয়ার ছিল ঘরটায়, আমরা তাতেই ভাগাভাগি করে বসলাম। ভদ্রলোক উঠে

পিছনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, এই কোম্পানির যে এত রমরমা সেটা কিন্তু এঘর থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। শরৎবাবু দোতলায় বসেন।

একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় হারমোনিয়ামের শব্দ পেলাম। রিহার্সলের তোড়জোড় চলছে নাকি? খুঁটি চলে গেলেও যাত্রা তো চালিয়েই যেতে হবে।

প্রোপাইটার শরৎ ভট্টাচার্যির আপিস দেখে কিন্তু ধারণা পালটে গেল। বেশ বড় ঘর, বড় টেবিল, চারপাশে মজবুত চেয়ার, দেয়ালে একটা বিরাট বারোমাসি ক্যালেন্ডার, আর্টিস্টদের বাঁধানো ছবি, দুটো আলমারিতে মোটা মোটা খাতপত্র ছাড়া একটা গোদারেজের আলমারি রয়েছে, মাথার উপর বঁাই বাঁই করে ঘুরছে পাখা।

টেবিলের পিছনে যিনি বসা তিনিই অবিশ্যি শরৎবাবু। তাঁর মাথায় টাক, কানের পাশে পাকা চুল, ঘন কালো ভুরু, মুখের চামড়া টান। বয়স বোঝা যায় না, শুধু বলা যায় পঞ্চান্ন থেকে পয়ষট্টির মধ্যে।

আপনিই প্রদোষ মিত্তির? ফেলুদার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

আর ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী, বলল ফেলুদা! ওরে বাবা, আপনি তো স্বনামধন্য ব্যক্তি মশাই! আমার বাড়িতে আপনার অনেক ভক্ত আছে!

লালমোহনবাবু বার চারেক হেঁ হেঁ করলেন, তারপর ভদ্রলোক বলতে আমরা চেয়ারে বসলাম। ফেলুদাই কথা শুরু করল।

ইন্দ্রনারায়ণবাবুর বাবা আমাকে তাঁর ছেলের খুনের তদন্ত করতে বলেছেন, সেই জন্যেই আসা।

শরৎবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আমি আর কী বলতে পারি বলুন, শুধু এইটুকুই জানি যে আমাদের একেবারে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। নাটক লিখিয়ে হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু অমন গান কেউ লিখত না, আর কেউ লিখবেও না! আহা-আকাশে হাসিছে চাঁদ, তুমি কেন আনমনা-কী গান! শুধু গান শুনতেই লোকে বার বার ফিরে ফিরে আসে।

আমরা শুনেছি। অন্য দল থেকে তাঁকে প্রলোভন দেখানো হচ্ছিল।

সে তো বটেই। তবে প্রলোভনে কোনও কাজ হয়নি। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে আমাকে ছাড়বার কথা সে কল্পনাও করতে পারত না। যখন প্রথম এল তখন তার বয়স পাঁচিশ। আমিই যে তাকে প্রথম সুযোগ দিয়েছিলাম সেটা সে কোনওদিন ভুলতে পারেনি! শেষটায় তার জীবননাশ করে আমায় খোঁড়া করে দিল।

শরৎবাবু ধুতির খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছলেন। তারপর বললেন, আগে একবার ওর মাথায় বাড়ি মারার চেষ্টা করেছিল রাস্তায়। অবিশ্যি সেটা খুনের চেষ্টা কিনা, আর সেটার সঙ্গে আসল খুনের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, সেটা বলতে পারব না। এই গালিটায় গুণ্ডা বদমায়েশের অভাব নেই। সেদিন ওরা দুজন এসে না পড়লে অন্তত ওর মানিব্যাগটি হাওয়া হয়ে যেত বলে আমার বিশ্বাস। সেটা আর হয়নি। তবে আসল খুনটা যে আমাকেও এক রকম খুন করা সে বিষয় আমার কোনও সন্দেহ নেই! আপনি তদন্ত করতে চান তো বীণাপাণি অপেরায় গিয়ে করুন; আমার নিজের আর কিছু বলার নেই।

আমরা উঠে পড়লাম। ইতিমধ্যে চা খাওয়া হয়ে গেছে সেটা বলে নিই। এর পরের স্টপ হল সুরেশ মল্লিক স্ট্রিট।

আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে উত্তরে যেতে গিয়ে বয়ে একটা মোড় নিয়ে তার পরের ডাইনের রাস্তাটাই হল সুরেশ মল্লিক স্ট্রিট। চোদ্দ নম্বরে বীণাপাণির আপিস বার করতে কোনও অসুবিধা হল না!

এখানে বাড়িতে ঢুকেই যাকে বলে উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বুঝলাম পুরোদমে মহড়া চলছে। ম্যানেজার অশ্বিনীবাবুকে বার করতে সময় লাগল না। বদমেজাজি চেহারা, টুথ ব্রাশ গোঁফ, বছর পঞ্চাশেক বয়স। বাইরের একটা ঘরে আমাদের বসতে দেওয়া হয়েছিল, ভদ্রলোক ঢুকে এসে ফেলুদার কার্ড দেখেই খাপ্পা হয়ে উঠলেন।

এ কি বোসপুকুরের খুনের ব্যাপার নাকি?

ফেলুদা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার উপর তদন্তের ভার পড়েছে। আপনি ইন্দ্রনারায়ণবাবুর সঙ্গে খুনের রাত্রে দেখা করেছিলেন, তাই আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করার ছিল।

পুলিশ তো এক দফা জেরা করে গেছে, আবার আপনি কেন? তা যাই হাক, আমি বলেই দিচ্ছি, আমি খুনের বিষয় কিছুই জানি না। আমি গোসলুম তাঁকে একটা অফার দিতে আমাদের তরফ থেকে। এর আগেও কয়েকবার গেছি!

ওঁকে নিমরাজি করিয়ে এনেছিলাম, কারণ ভারত অপেরা ওঁকে যে টাকা দিত। আমরা তার চেয়ে ঢের বেশি অফার করি। আমাদের সে জোর আছে বলেই করি। কাজেই এ অবস্থায় আমরা যেটা চেয়েছিলাম সেটা হল উনি যাতে আমাদের দলে যোগ দেন। উনি যদি মরেই যান তা হলে আমাদের লাভটা হচ্ছে কোত্থেকে?

অন্য দলের ক্ষতি হলে তাতেওঁ তো আপনাদের লাভ।

না। ওসব ছ্যাঁচড়ামোর মধ্যে আমরা নেই। এ দল সে দল থেকে আর্টিস্ট ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা আমরা সব সময়ই করি, কিন্তু তাতে সফল না হলে কি আমরা সে আর্টিস্টকে প্রাণে মেরে অন্য দলের ক্ষতি করব?

আপনি বলছিলেন উনি নিমরাজি হয়েছিলেন। তার কোনও প্রমাণ আছে কি?

গোড়ায় যখন চিঠি লিখে অফার দিই, তার একটা পোস্টকর্ডের উত্তর আছে, দেখতে চান। দেখাতে পারি।

ফেলুদা বলতে ভদ্রলোক ফাইল থেকে পোস্টকার্ডটা বার করে দেখালেন। তাতে দেখলাম ইন্দ্রনারায়ণবাবু সত্যিই বলেছেন, আপনাদের প্রস্তাব আমি ভেবে দেখছি। আপনি মাস খানেক বাদে অনুগ্রহ করে আরেকবার অনুসন্ধান করবেন। অর্থাৎ ইন্দ্রনারায়ণবাবু বীণাপাণি অপেরার প্রস্তাবে পুরোপুরি না করেননি। তাঁর মনে একটা দ্বিধার ভাব এসেছিল।

ফেলুদা বলল, সেদিন রাত্রে যে আপনি গেলেন, তখন আপনাদের মধ্যে কোনও কথা কাটাকাটি হয়েছিল?

আমি ওঁকে নানান ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম সেটা ঠিক আর তাতে হয়তো গলা একআধবার চড়ে যেতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণবাবু মাথা ঠাণ্ডা লোক ছিলেন; সেই কারণেই তাঁর কাজটা এত ভাল হত। উনি বললেন, ভারত অপেরার সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক। সেটা ভাঙা তো সহজ কথা নয়। কিন্তু তাও বলছি আপনারা পারলে আমাকে আর কিছুটা সময় দিন। একটা নতুন

নাটক আমি লিখছি ভারত অপেরার জন্য। সেটা দেব বলে কথা দিয়েছি; সে কথার তো আর নড়াচড় করতে পারি না। এই বছরের শেষে আমি আবার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব—এই হল শেষ কথা। তারপর আমি চলে আসি। তখন পৌনে এগারোটা।...

গোলমেলে ব্যাপার, ফেলুদা মন্তব্য করল চৌরঙ্গিতে একটা রেস্টোরেন্টে বসে কফি খেতে খেতে।

বীণাপাণি অপেরাই যে গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করেছে সেটা এখন আর মনে হচ্ছে না—তাই না? বললেন লালমোহনবাবু।

তা হচ্ছে না, বলল ফেলুদা, তবে প্রশ্ন হচ্ছে শত্রুবিহীন এই ব্যক্তিটির উপর কার এত আক্রোশ ছিল? ভাড়াটে গুণ্ডাই যদি মেরে থাকে তা হলে ফেলুমিত্তিরের বিশেষ কিছু করবার নেই। সেখানে পোদারমশাই টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবেন।

কিন্তু অশ্বিনীবাবুর কথা শুনে—

অশ্বিনীবাবু যে সত্যি কথা বলছেন সেটাই বা মেনে নিই। কী করে? সেদিন ওঁর কথায় যে ইন্দ্রনারায়ণ সরাসরি না করে দেননি। সেটাই বা কে বলতে পারে? সাক্ষী কই?

আচ্ছা, বাড়ির লোক যদি খুন করে থাকে?

সেটার সম্ভাবনা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কীর্তিনারায়ণ তাঁর ছোট ছেলেকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তিনি যদি তাঁর উইলে ইন্দ্রনারায়ণকে বেশি টাকা দিয়ে থাকেন, তাতে বড় ভাইদের কি মনে হতে পারে না ছাটভাইকে হটিয়ে তাদের শেয়ার কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া?

এটা আপনি মোক্ষম বলেছেন, বললেন লালমোহনবাবু।

কিন্তু ব্যাপার কী জানেন? খুন জিনিসটা করা অত্যন্ত কঠিন। প্রচণ্ড তাগিদ না থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুনের সাহস সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। আগে

অন্য ভাই দুটোকে একটু বাজিয়ে নিই, তারপর তেমন বুঝলে ওটা নিয়ে ভাবা যাবে।

ফেলুদার কপালে ভ্রূকুটি তাও যাচ্ছে না দেখে জিজ্ঞেস করলাম। সে কী ভাবছে। ফেলুদা বলল, সেকেন্ড ব্রাদার হরিনারায়ণের কথা।

কেন?

লোকটা আবার ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ভক্ত—ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক। এই নিয়ে যে দুটো প্রশ্ন করব তারও জো নেই। কারণ ফেলুমিত্তির ও ব্যাপারে একেবারেই কাঁচা।

লালমোহনবাবু বললেন, আমার কাছে একটা পাশ্চাত্য সংগীতের এনসাইক্লোপিডিয়া আছে—এক ভলুম, সাড়ে সাতশো পাতা। তাতে আপনি যা জানতে চান সব পাবেন।

আপনি ও বই নিয়ে কী করছেন?

ওটা একটা সেটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল—তাতে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, মেডিসিন, সায়েন্স, অ্যানিম্যালস—সবই আছে। আমি নিজে উলটে পালটে দেখেছি মিউজিকের বইটা হেডন, মোজার্ট, বিথোভেন সব বড় বড় সুরকারদের জীবনী রয়েছে।

আমি এসব সুরকারদের রচনা শুনিনি বটে, কিন্তু এদের নামের উচ্চারণগুলো অন্তত আমার জানা আছে, কিন্তু আপনার নেই।

কী রকম?

হাইড্রন, মোৎসার্ট, বেটাফেন-এই হল আসল উচ্চারণ।

হাইড্রন, মোৎসার্ট, বেটাফেন-থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, আর ভুল হবে না।

এখনই দিতে পারেন বইটা?

অ্যালবত! আপনার জন্য এনি টাইম।

আমরা রেস্টোরান্ট থেকে গড়পার গিয়ে লালমোহনবাবুর বইটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোককে বাড়িতে রেখে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

বাকি দিনটা ফেলুদার সঙ্গে আর কথা বলা সম্ভব হয়নি, কারণ সে ঘর বন্ধ করে এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়েস্টার্ন মিউজিক পড়ল।

৬

শনিবার সকাল দশটায় বোসপুকুর গিয়ে প্রথমেই যার সঙ্গে কথা হল, সে হল হরিনারায়ণবাবুর মেয়ে লীনা। লীনার আজ ইস্কুল ছুটি, সে ক'দিন থেকেই শুনেছে বাড়িতে ডিটেকটিভ এসেছে। তাই উদগ্রীব হয়ে আছে। ফেলুদার ভক্ত হওয়াতে তার সঙ্গে কথা বলতে আরও সুবিধা হল।

তোমার ছোটকাকা তোমাকে খুব ভালবাসতেন, তাই না? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

শুধু ভালবাসতেন না, বলল লীনা, আমরা দুজনে বন্ধু ছিলাম। কাকার সব লেখা আগে আমাকে পড়ে শোনাতেন। আমার যদি কোনও জায়গা গোলমাল লাগত। তা হলে কাকা সেটা বদলে দিতেন।

আর গান?

আমাকে প্রথম শোনাতেন।

তুমি নিজে গান ভালবাস?

আমি পিয়ানো শিখছি।

তার মানে তো বিলিতি বাজনা।

হ্যাঁ, কিন্তু আমার রবীন্দ্রসংগীতও ভাল লাগে, আর কাকার গানও ভাল লাগত। আমি নিজেও গান করি একটু একটু।

তোমার কাকা কোনওদিন ভারত অপেরা ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলেন তোমাকে?

বীণাপাণি অপেরা কাকাকে অনেক টাকা দিতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু আমার মনে হয় না। কাকা কোনওদিন ভারত অপেরা ছাড়তেন। আমায় বলতেন, আমার শেকড় ভারত অপেরায়; শেকড় তুলে অন্য জায়গায় গেলে কি আর আমি বাঁচব?

কাকা একটা নতুন নাটক লিখছিলেন সেটা তুমি জান?

একটা কেন; সম্রাট অশোক তো শেষ হয়নি; তা ছাড়া কাকার চারটে নাটক লেখা ছিল। এছাড়া ওঁর প্রায় পনেরো-কুড়িটা খুব ভাল ভাল গান লেখা ছিল যেগুলো এখনও যাত্রায় ব্যবহার হয়নি। আর নাটকের খসড়া যেগুলো ছিল- সেও প্রায় আট-দশটা হবে।–সেগুলো তো খসড়াই রয়ে গেল!

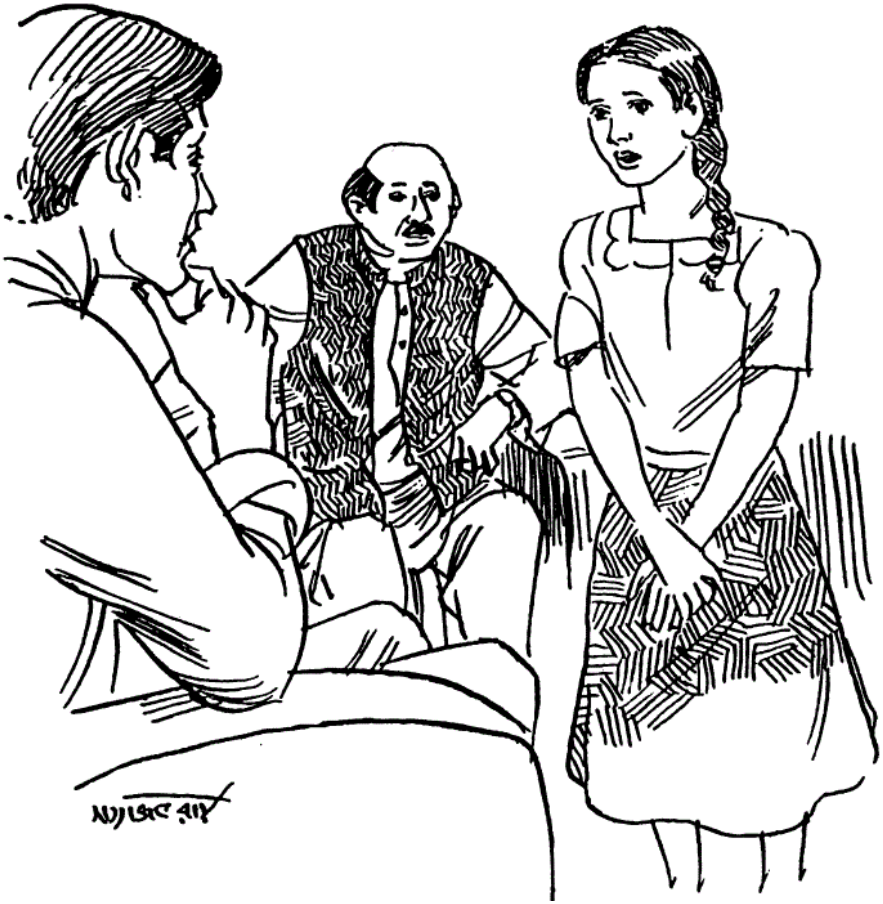

লীনার সঙ্গে কথা বললাম। প্রদ্যুম্নবাবুর ঘরে। খুব সাদাসিধে। ঘর, লাইব্রেরির ঠিক পাশেই। ভদ্রলোক বললেন যে ওঁর রিসার্চের কাজ প্রায় শেষ

হয়ে গেছে, এর পর কাগজপত্র সব নিয়ে উনি বইটা লেখার জন্য শ্রীীরামপুরে ওঁর বাড়িতে চলে যাবেন! ওঁর আন্দাজ এক বছর লাগবে। বইটা লিখতে।

অবিশ্যি রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানে থাকতেই হবে সেটা বোধ হয় বুঝতেই পারছেন।

সে কথা পুলিশ আগেই বলে দিয়েছে।

আপনি চলে গেলে কীর্তিনারায়ণবাবুর সেক্রেটারির কী হবে?

সে আমি অন্য একটি ছেলেকে বদলি দিয়ে যাব। জীবনী একবার লিখতে আরম্ভ করলে অন্য কোনও দিকে মন দিতে পারব না।

ফেলুদা ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছিল, আর ঘরের দরজা দিয়ে বাইরের কী অংশ দেখা যায় সেটাও দেখছিল। দেখলাম প্রদ্যুম্নবাবুর শোবার ঘর থেকে ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাজের ঘরের দরজাটা দেখা যায়, কিন্তু লাইব্রেরি থেকে দুটোর একটা ঘরও দেখা যায় না। ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে গলি দেখা যায়—যদু নস্কর লেন। বোসপুকুর রোডটা হল বাড়ির সামনে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের বাগানের পরে।

লীনা ইতিমধ্যে তার বাবা হরিনারায়ণবাবুকে আমাদের কথা বলে রেখেছেঃ আমরা দোতলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দার পাশে একটা বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। বেশ সুন্দর সাজানো ঘর, তাতে কিছু দামি পুরনো জিনিসও রয়েছে বলে মনে হল। যে সব জিনিস মানুষ কিউরিওর দোকান থেকে কেনে। ঘরের এক পাশে একটা বড় তাকে হাইফাই যন্ত্র রেকর্ড আর ক্যাসেট চালনার জন্য, আর তাকের উপরে দুদিকে দুটো স্টিরিও স্পিকার।

হরিনারায়ণবাবুকে দেখেই লীনার বাবা বলে বোঝা যায়। বেশ সুপুরুষ চেহারা, রং এ বাড়ির আর সকলের মতোই ফরাসা, খালি শরীরে মাংসটা একটু বেশি।

ভদ্রলোক ফেলুদা আর লালমোহনবাবুকে বললেন, আপনাদের দুজনের নামই শোনা বলে মনে হচ্ছে। এখন বলুন কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।

ফেলুদা প্রথমেই কাজের কথায় গেল না। বলল, আপনার তো দেখছি বিরাট গান-বাজনার কালেকশন।

হ্যাঁ, তা বিশ বছর হল শুনছি। ওয়েস্টার্ন মিউজিক। ওটাতেই কান বসে গেছে, দিশি আর ভাল লাগে না।

আপনার কোনও ফেভারিট কম্পোজার আছে নেকি?

চাইকোভস্কি খুব ভাল লাগে; সুমান, ব্রাম্‌স, শৌপ্যাঁ।

অর্থাৎ রোম্যান্টিক যুগটাই আপনার বেশি প্রিয়?

হ্যাঁ।

আপনার ছোট ভাই বেহালা বাজালেও বিলিতি সংগীতের দিকে ঝোঁকেননি বোধহয়।

না। ওর ব্যাপারটা ছিল একেবারে উলটো। শুনেছি। ওর নাকি ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু যাত্রা দেখার কোনও তাগিদ কোনওদিন অনুভব করিনি। আমার স্ত্রী আর মেয়ে গেছে কয়েকবার।

ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার নিজের কোনও থিওরি আছে?

ব্যাপার কী জানেন, ও যে ক্লাসের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করত তাদের তো আর ঠিক ভদ্রলোক বলা চলে না। যাত্রার পরিবেশটাই খারাপ! কোথায় কার সঙ্গে কী গোলমাল পাকিয়ে রেখেছিল কে জানে? তারই একজন এসে বদলা নিয়েছে–এ ছাড়া আর কী? জিনিসপত্র যখন কিছুই চুরি যায়নি তখন আর কী কারণ থাকতে পারে তা তো আমি জানি না। ওর সঙ্গই ওর কাল হয়েছিল। আপনি এনকোয়ারি করতে চাইলে ওই যাত্রা পাটিগুলোতে গিয়েই করুন। এখানে বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না।

পুলিশে খবর কি আপনার দাদা দেন?

আমি, দাদা দুজনেই দিই! বাড়িতে খুন হলে সেটাই তো স্বাভাবিক। চন্টু করে কেউ প্রাইভেট ডিটেকটিভ ডাকে কি? বাবার তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবা চিরকালই ছিটগ্রস্ত। কী করে যে ব্যারিস্টারি করেছেন এতদিন তা জানি না!

আপনার বাবা বোধহয় আপনার ছোট ভাইকে খুব ভালবাসতেন।

সেটাও ওই ছিটেরই উদাহরণ। বাবা গতানুগতিকতা পছন্দ করেন না। এই ব্যাপারে বাবার সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষ কন্দর্পনারায়ণের মিল আছে।

ফেলুদা উঠে পড়ল। আমিও বুঝতে পারছিলাম যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আর কথা বলে কোনও ফল হবে না।

বড় ভাই দেবনারায়ণ ছিলেন বাড়ির পশ্চিম দিকের বারান্দায়, বেতের চেয়ারে বসে। সামনে বেতের টেবিল, তার উপর কোল্ড বিয়ার রাখা। আমাদের অভিবাদন জানিয়ে ভদ্রলোক বিয়ার অফার করলেন, আমরা স্বভাবতই মাথা নেড়ে না জানালাম।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ এমপ্লয় করা বুঝি বাবার প্ল্যান?

ফেলুদা হেসে বলল, বোধহয় তাই, কারণ আর কারুরই শখের গোয়েন্দার উপর আস্থা নেই।

এ জিনিস উপন্যাসে চলে, রিয়েল লাইফে চলে না।

ভদ্রলোক কথাগুলো বলছেন একেবারে শুকনো মুখে। সত্যি বলতে কী, এত গভীর লোক কমই দেখেছি।

দেবনারায়ণবাবু বললেন, আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন তো? সেটা অনুমান করেই বলছি, ইন্দ্রনারায়ণ ছিল আমাদের পরিবারের কলঙ্ক। আমাকে ক্লাবে অনেক সময়ই লোকে তার কথা জিজ্ঞেস করেছে; তার যাত্রা কেমন চলছে, গান পপুলার হচ্ছে কিনা, সে বেহালা কেমন বাজায়-ইত্যাদি। আমি মাথা হেঁট না করে কোনও কথার জবাব দিতে পারিনি। আমাদের আপনি ভাইয়ের

এই দশা হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তার মৃত্যুর জন্যেও সে নিজেই দায়ী। তার উপর আমার কোনও সহানুভূতি নেই। আর আপনিও যে তদন্তের ভার নিয়েছেন, আপনার ওপরেও আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। ওকে খুন করেছে। যাত্রা দলের গুণ্ডা। দে আর অল পোটেনশিয়াল ক্রিমিন্যালস। আপনি কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন?

দেবনারায়ণবাবুর সঙ্গে কথাও এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

নীচে আসার সময় ফেলুদা প্রদ্যুম্নবাবুকে বলল, একটা জিনিস দেখার বড় কৌতুহল হচ্ছে আমার; কন্দর্পনারায়ণের বিলেতের ডায়রি; কাটা খণ্ড আছে সবসুদ্ধ?

দুটো। উনি বিলেতে ছিলেন এক বছরের কিছু বেশি।

ওটা দিন-তিনেকের জন্য ধারা পাওয়া যাবে?

নিশ্চয়ই।

ফেলুদা তার থলিতে বই দুটো নিয়ে নিল, আমরা আবার বাড়িমুখে রওনা দিলাম।

৭

কীরকম মনে হচ্ছে বলুন তো? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন একমুঠো ডালমুট মুখে পুরে।

আমরা বোসপুকুর থেকে ফিরেছি। মিনিট পনেরো হল, শ্রীনাথ সবেমাত্র চা-ডালমুট দিয়ে গেছে।

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, শুধু অপেরা-অপেরায় খাওয়া-খাওয়ি হলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না। বাড়ির লোকদের একেবারে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। অবিশ্যি দুভাইয়ের মেজাজ ছাড়া এখনও তাদের বিষয় আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি! দুজনের মধ্যে কারুর যদি টাকার টানাটানি দেখা দিয়ে থাকে, তা হলে ছোট ভাই যাতে বাপের টাকা না পায় সেদিকে সে দৃষ্টি দিতে পারে। কীর্তিনারায়ণ যদি তাঁর ছোট ছেলেকে বেশি টাকা দিয়ে থাকেন তা হলে তো তাঁকে সে উইল চেঞ্জ করতে হবে। তার ফলে অবশিষ্ট দুভাইয়ের ভাগে নিশ্চয়ই বেশি করে পড়বে।

আমার কিন্তু মশাই দেবনারায়ণকে ভাল লাগল না। ওরকম একটা কাঠখোট্টা লোক সচরাচর দেখা যায় না।

বাড়িতে দেখে এদের পুরোপুরি বিচার করা যাবে না। আমার জানার ইচ্ছে সন্ধেবোলা ওঁরা ক্লাবে গিয়ে কী করেন।

সেটা জানছেন কী করে?

দুই ক্লাবেই আমার চেনা লোক মেম্বর আছে, বলল ফেলুদা। দুজনেই আমার সহপাঠী ছিল। বেঙ্গল ক্লাবে আনিমেষ সোম, আর স্যাটার্ডে ক্লাবে ভাস্কর দেব। দুজনেই বড় চাকুরে। তাদের জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।

এই ক্লাবগুলির খালি নামই শুনেছি; ভেতরে যে কী বস্তু জানিও না।

আপনার ফুর্তি হবার মতো তেমন কিছুই নেই। আপনি মদ্য পান করেন না, তাঁস খেলেন না, বিলিয়ার্ড খেলেন না—আপনি ক্লাবে গিয়ে কী করবেন?

তা বটে।

ফেলুদা আর সময় নষ্ট করল না। প্রথমে বেঙ্গল ক্লাবের মেম্বর অনিমেষ সোমকে ফোন করল। অবিশ্যি সাতবার ডায়াল করার পর নম্বর পাওয়া গেল। একতরফা কথা শুনে পুরো ব্যাপারটা আচ করতে পারলাম না; তাই ফেলুদা খুলে বলে দিল।

দেবনারায়ণবাবু ক্লাবে যান নিয়মিত এবং অধিকাংশ সময় মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকেন। খেলাধুলার মধ্যে নেই, লোকজনের মধ্যে আড্ডা প্রায় মারেন না বললেই চলে, লন্ডনের খবরের কাগজ নিয়মিত পড়েন। আরেকটা ব্যাপার, ভদ্রলোকের আপিসে গণ্ডগোল যাচ্ছে, স্ট্রাইক হবার সম্ভাবনা আছে।

এরপর ফেলুদা ভাস্কর দেবকে ফোন করে একবারে পেয়ে গেল। এখানে শুধু ফেলুদার দিকটা শুনেই মোটামুটি পুরো ব্যাপারটা আঁচ করে নিলাম।

কে, ভাস্কর কথা বলছিস? আমি ফেলু, প্রদোষ মিত্তির।

—

তুই তো স্যাটারডে ক্লাবের মেম্বর, তাই না?

—

তোদের একজন মেম্বর সম্বন্ধে একটু ইনফরমেশন দরকার ছিল। হরিনারায়ণ আচার্য।

—

হ্যাঁ হ্যাঁ, যার ভাই খুন হয়েছে। এ লোকটা মানুষ কেমন? তোর সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়ই?

—

ও বাবা, জুয়াড়ি? হেভি স্টেকসে পোকার খেলে? তার মানে গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের বাতিকটা পেয়েছে আর কী?

—

তুইও খেলেছিস ওর সঙ্গে?

—

দেনা বেড়ে যাচ্ছে তাও খেলা থামায়নি? তার মানে তো খুবই নেশা বলতে হবে!

—

এনিওয়ে, অনেক ধন্যবাদ ভাই। আমার উপর আবার তদন্তের ভার পড়েছে, তাই এদিক সেদিক থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি। ঠিক আছে।–আসি!

ফেলুদা ফোন রেখে বলল, বোঝে! লোকটা খুন করবে। কী, বরং তহবিল তছরুপ করলে বুঝতে পারতাম। দেদার দেনা হয়ে গেছে তাসের জুয়াতে, অথচ দেখে বোঝবার কোনও উপায় নেই!

লালমোহনবাবু হঠাৎ ভীষণ একসাইটেড হয়ে পড়লেন।

ও মশাই-এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার! বাপ না মরলে তো আর উইল থেকে কোনও টাকা আসছে না। টাকার যদি দরকারই হয় ছেলের তা হলে তো এবার কীর্তিনারায়ণের খুন হওয়া উচিত!

আপনার গোয়েন্দাগিরিতে মাথা খুলে যাচ্ছে, লালমোহনবাবু! আপনি খুব ভুল বলেননি।

তা হলে তো এ-ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

শুনুন। ফেলুদা চায়ের কাপটা নামিয়ে চেয়ারে একটু এগিয়ে বসে বলল, আপনাকে আগেও বলেছি, খুন জিনিসটা অত সহজ নয়। ও বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন আছে! একটা খুন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। ছোট ভাই যে বাবার প্রিয় ছিল একথাও অজানা নেই। সেখানে ছোট ভাই খুনী হবার পর যদি বাবাও খুন হন, তাতে দু-ভাইয়ের উপর যে পরিমাণ সন্দেহ বর্তবে, তাতে তারা কোনওমতেই পার পাবে না। এক তো পুলিশ, তার উপর ফেলুমিস্তির। তাদের নিজেদের কি প্রাণের ভয় নেই? উইলের জন্য যদি ইন্দ্রনারায়ণকে খুনও করা হয়ে থাকে, বাপকে মারার কোনও তাড়া নেই, কারণ ভদ্রলোকের উনআশি বছর বয়স, ডায়াবেটিসের রুগি, একটা স্ট্রোক ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। ওঁর আর ক'দিন? তবে হ্যাঁ-হরিনারায়ণের সম্বন্ধে তথ্যটা জরুরি তথ্য। বাড়িতে মানুষটাকে চেনা যায়নি। আমি জানতাম যারা গান-বাজনার ভক্ত তারা সাধারণত কোমল প্রবৃত্তির লোক হয়। এ দেখছি। একেবারে অদ্ভুত কম্বিনেশন।

ওই পুরো ফ্যামিলিটাই তো তাই মশাই!

কথাটা বলে সামনে পড়ে থাকা শনিবারের স্টেটসম্যানটা হাতে তুলে নিলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদাও চোখ ঘুরিয়েছিল কাগজটার দিকে, হঠাৎ কী জানি দেখে সে কাগজটা লালমোহনবাবুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর মিনিট খানেক ধরে পিছনের পাতায় চোখ বুলাল। তারপর কাগজটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলল, আই সি।

মিনিট খানেক পর আবার বলল, বুঝলাম।

তারপর আরও আধ মিনিট পরে বলল, এই ব্যাপার!

লালমোহনবাবু আর থাকতে না পেরে বললেন, কী বুঝলেন মশাই?

তাতে ফেলুদা বলল, বুঝলাম গোয়েন্দা হলেও আমার জ্ঞান কত সীমিত। বুঝলাম এখনও আমার অনেক কিছু শেখার আছে।

ফেলুদা যখন রহস্য করতে চায় তখন তার জাল ভেদ করে এমন সাধ্য কারুর নেই। কাজেই ও যখন মিনিট খানেক পরে বলল, আজ একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে, তখন বুঝলাম এটাও রহস্যেরই একটা অঙ্গ।

কী ব্যাপার? লালমোহনবাবু যথারীতি জিজ্ঞেস করলেন।

আজ আমরা তিনজনেই প্লেসের মাঠে যাচ্ছি।

সে কী? রেসের মাঠে? কেন মশাই?

এটা আমার অনেক'দিনের একটা শাখ। আজ বিকেলটা আমরা ফ্রি আছি। কলকাতায় এমন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতি শনিবার সেই কত কাল থেকে, কিন্তু আমরা তার ধারেপাশেও যাব না এটা মোটেই ঠিক নয়। অন্তত একবারের জন্য সব রকম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকা ভাল।

এ কথাটা আমারও অনেক'দিন মনে হয়েছে মশাই, চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বললেন। লালমোহনবাবু। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, চেনা কেউ যদি দেখে ফেলে জুয়াড়ি ভাবে, এইখানেই আমাদের সঙ্কোচ।

এবারে সেটার কোনও সম্ভাবনা নেই!

কেন?

কারণ আমরা তিনজনেই যাব ছদ্মবেশে।

ওঃ, দুর্দান্ত ব্যাপার মশাই! আমাকে একটা ফ্রেঞ্চকার্ট দাড়ি দিতে পারবেন?

আমি মনে মনে তাই ভাবছিলাম।

গ্রেট!

মেক-আপে ফেলুদার জুড়ি নেই সেটা আগেও বলেছি, কিন্তু এতদিন শুধু ওর নিজের মেকআপই দেখেছি, এবার ও আমাকে আর লালমোহনবাবুকে যেভাবে মেক-আপ করল তাতে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেরাই হকচাকিয়ে গেলাম। লালমোহনবাবুকে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি আর ঢেউ খেলানো চুল, আর আমার গোঁফ দাঁড়ি আর পার্ক স্ট্রিট-মাক ঝাঁকড়া চুলের কোনও তুলনা নেই।

ফেলুদা নিজে একটা চাড়া দেওয়া মিলিটারি গোঁফ লাগিয়েছে, আর একটা পরচুলা পরেছে। যাতে মনে হয় চুলটা ছোট করে ছাঁটা। এই সামান্য ব্যাপারেই ওর চেহারায় আকাশ পাতাল তফাত হয়ে গেছে।

রেসের মাঠে যে কোনওদিন যাব সেটা ভাবতে পারিনি। রাস্তার ভিখিরি থেকে রাজা মহারাজা অবধি সবাই যদি কোথাও একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই জায়গায় জমায়েত হয় তো সেটা হল রেসের মাঠ। এমন দৃশ্য কলকাতা শহরে আর কোথাও দেখা যায় না, কোথাও দেখার সম্ভাবনাও নেই। একমাত্র রেসের মাঠেই মুড়ি মিছরি এক দর।

ঘোড় দৌড় এখনও শুরু হয়নি, আমরা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। এক জায়গায় একটা বেড়ায় ঘেরা মাঠের মধ্যে যে সব ঘোড়া রেসে দৌড়ুবে তাদের ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে। ফেলুদা বলল জায়গাটাকে বলে প্যাডক; আরেকটা জায়গা-যেখানে একটা একতলা বাড়ির গায়ে সার সার জানালা, সেখানে বেটিং প্লেস করা হচ্ছে। সকলের মতো আমরাও একটা করে রেসের বই কিনে নিয়েছি।

অভিনয় ভাল হবে বলে। লালমোহনবাবু সেটা ভয়ংকর মনোযোগের সঙ্গে পাতা উলটে দেখছেন।

আমরা ছিলাম সব সুদ্ধ আধা ঘণ্টা। প্রথম রেসটা দেখলাম, লোকদের মরিয়া হয়ে ঘোড়ার নাম ধরে চিৎকার করা শুনলাম, তারপর ফেলুদা হঠাৎ এক সময় বলল, যে প্রয়োজনে আসা সেটা যখন মিটে গেছে তখন আর বৃথা মেক-আপের বোঝা বয়ে কী লাভ?

কী প্রয়োজনের কথা বলছে জানি না, জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাব এমন ভরসা নেই, তাই আমরা তিনজন বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবুর গাড়ি খুঁজে বার করে তাতে চেপে বসলাম।

৮

রবিবার সকালে দারোগা মণিলাল পোদ্দারের ফোন এল। বললেন, কিছু এগোলেন? ফেলুদা বলল, আগে মানুষগুলোকে চেনার চেষ্টা করছি, নইলে এগোতে পারব না। বেশ জটিল কেস বলে মনে হচ্ছে।

মণিলালবাবুর কথা থেকে জানা গেল যে আরেকবার আচার্য বাড়িতে ডাকাত পড়লে উনি আশ্চর্য হবেন না। প্রথমবার তো খুনই করেছে, কোনও জিনিস তো নেয়নি; ওঁর ধারণা যাত্রার যে দলটা খুন করিয়েছে তারা ইন্দ্রনারায়ণবাবুর অন্য নাটক আর গানগুলোও হাতাবার চেষ্টা করবে। বোসপুকুরের কাছেই একটা গলি আছে, রাম পরামানিক লেন, সেটা নাকি নটোরিয়াস গুণ্ডাদের আড্ডা। তা ছাড়া এটাও মণিলালবাবু সন্দেহ করছেন যে আচার্য বাড়ির বেয়ারা সন্তোষের সঙ্গে হয়তো এই গুণ্ডদলের যোগসাজশ আছে।

ফেলুদা প্রশ্ন করল, আপনারা কি বাড়ির পিছনের যদু নস্করের গলিতে পুলিশ পাহারা রাখছেন?

তা রাখা হচ্ছে বইকী, বললেন পোদ্দারমশাই।

তেমন দরকার হলে একবার অন্তত একরাতের জন্য তুলে নেওয়া যেতে পারে কি?

আপনি কি গুণ্ডাদের প্রলোভন দেখাতে চান?

ঠিক তাই।

তা বেশ। আপনার প্রয়োজন হলে বলবেন, আমরা পাহারা সরিয়ে নেব।

পোদ্দার মশাই-এর ফোনটা এসেছিল সাড়ে সাতটার সময়। তার পনেরো মিনিট পরেই ফোন করলেন প্রদ্যুন্নবাবু, বললেন আধা ঘণ্টা থেকে নাকি চেষ্টা করছেন। ব্যাপার গুরুতর। গতকাল রাত্রে বারোটার সময় নাকি চোর এসেছিল আচার্যবাড়িতে। ইন্দ্রনারায়ণবাবুর ঘরে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই কোনও চাকরের

সাহায্যে, কারণ পিছনের গলিতে পুলিশ পাহারা আছে। একটা শব্দ পেয়ে প্রদ্যুম্নবাবু নাকি তাঁর কাজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। তাতে চোরটা পালায়। প্রদ্যুম্নবাবু দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে ধাক্কা দিয়ে প্রদ্যুম্নবাবুকে মাটিতে ফেলে দেয়। ফলে ভদ্রলোকের হাঁটুতে চাট লেগেছে, উনি নাকি খুঁড়িয়ে হাঁটছেন।

ফোন রাখার পর ফেলুদা বলল, এখন সত্যিই মনে হচ্ছে ওঁর কাগজপত্র সরাবার উদ্দেশ্যেই ইন্দ্রনারায়ণবাবুকে খুন করা হয়েছিল। যে লেখকের নাটক আর গানের এত চাহিদা, সে পাঁচপাঁচ খানা নাটক আর পনের-বিশ খানা গান লিখে রেখে যাবে, আর তার উপরে চোখ পড়বে না। অন্য যাত্রা দলের? অবিশ্যি নিয়মমতে এই সব গান আর নাটক ভারত অপেরারই প্রাপ্য। তারা যাতে না পায় সেইজন্যেই এগুলো হাতবার এত উদ্যোগ।

আমি বললাম, অন্য যাত্রার দল যদি ইন্দ্রনারায়ণের এই সব গান আর নাটকের কথা জেনে থাকে, তা হলে সে কথা নিশ্চয়ই ইন্দ্রনারায়ণ নিজেই বলেছেন। তার মানে তিনি ভারত অপেরার প্রতি যতটা লয়েল ছিলেন ভাবছিলাম, আসলে হয়তো ততটা ছিলেন না। সত্যিই হয়তো তিনি অন্য দলে যাবার কথা ভাবছিলেন।

কিন্তু তা হলে খুনটা করল কে এবং কেন?

হয়তো বীণাপাণি অপেরাকে ইন্দ্রনারায়ণ কথা দিয়েছিলেন, তাই আরেকটা দল সে পথ বন্ধ করেছে।

ফেলুদা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে আমার কথায় সায় দিল। সত্যি, এখনও পর্যন্ত রহস্যের কোনওই কিনারা হল না।

ফেলুদা তার বিখ্যাত সবুজ খাতা খুলে কী যেন লিখতে শুরু করল। আজ সকাল থেকেই তাকে ভীষণ সিরিয়াস দেখছি। কী যেন একটা নতুন চিন্তা তার মাথায় এসেছে সেটা বুঝতে পারছি না।

নটার সময় যথারীতি লালমোহনবাবু এসে হাজির হলেন। ফেলুদা বলল, আপনার মিউজিক এনসাইক্লোপিডিয়াটা আরও দু-চার দিন রাখছি।

দু-চার দিন কেন, দু-চার মাস রাখলেও কোনও আপত্তি নেই।

অনেক কিছু নতুন জ্ঞান অর্জন করছি বইটা থেকে। মেলডি, হারমনি, পলিফনি, কাউন্টারপয়েন্ট—অনেক কিছু জানা গেল। মিউজিকের ইতিহাসেও দেখছি রহস্য রয়েছে—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কম্পোজার মোৎসার্টকে নাকি আরেক কম্পোজার সালিয়েরি বিষ খাইয়ে হত্যা করেন। অথচ এই ক্রাইমের কোনও কিনারা হয়নি।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু আজ আমাদের প্ল্যানটা কী?

আচার্য বাড়িতে নাকি কাল আবার ডাকাত পড়েছিল, কিন্তু প্রদ্যুন্নবাবুর তৎপরতার জন্য কিছু করতে পারেনি। আমার বিশ্বাস রাত্তিরে ও বাড়িটাকে একটু চোখে চোখে রাখা ভাল।

রাত্তিরে?

হ্যাঁ। এই ধরুন সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু করে একটা দেড়টা পর্যন্ত।

সেটা কী করে সম্ভব হচ্ছে?

বাড়ির উত্তর গা ঘেঁষে গলি গেছে। উত্তর দিকেই পিছনের দরজা। ধরুন যদি সেই গলির ফুটপাথে বসে থাকা যায় বাড়ির দিকে চোখ রেখে।

ফুটপাথে বসে থাকা? তিনজন ভদ্রলোক ফুটপাথে বসে থাকবেন আর রাস্তার লোক সন্দেহ করবে না?

তা করবে না। যদি তাদের আর ভদ্রলোক বলে না মনে হয়।

ফেলুদার প্ল্যানটা শুনে মাথা ঘুরে গেল। বোঝাই যাচ্ছে ও আবার ছদ্মবেশের কথা বলছে। কিন্তু কী ছদ্মবেশ? উত্তরটা ফেলুদাই দিল।

আপনি কি তাস একেবারেই খেলেননি? লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

স্ক্রু খেলতুম এক কালে, আর গোলাম চোর...।

যাই হাক, তাস চেনেন তো গোলাম দেখলে সাহেব বলে ভুল হবে না তো, আর চিড়িতন দেখলে ইস্কাপন?

পাগল!

তা হলে তিনজন প্লাস হরিপদবাবু মিলে টোয়েন্টি-নাইন খেলব। উৎকলাবাসী চারজন চাকর হয়ে যাব আমরা। মেক-আপের ভর অবিশ্যি আমার উপর। নেহাতই কথা বলার দরকার হলে বলা হবে, আর তখন অকারান্ত শব্দ হসন্ত দিয়ে শেষ করা চলবে না। অর্থাৎ তাস হবে তাসঅ, সাহেব হবেসাহেবঅ। বুঝেছেন?

বুঝেছি মিস্টারআ মিত্তিরঅ।

লালমোহনবাবুর চোখে একটা ভাসা ভাসা চাহনি দেখে বুঝতে পারলাম। তিনি বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছেন। আমি অবাক ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি, তবে এটা বুঝেছি যে তদন্তটা বেশ জমে উঠেছে।

লালমোহনবাবু বারোটা নাগাত যাবার সময় বলে গেলেন আবার সন্ধ্যা সাতটায় আসবেন, আমাদের বাড়িতেই খাবেন। তারপর আমরা এখান থেকেই মেক-আপ নিয়ে এগারোটা নাগাত চলে যাব যদু নস্কর লেনে। গলিটা দেখে নিরিবিলি বলেই মনে হয়েছে, একটা ল্যাম্প পোস্ট দেখে তার নীচে চাদর বিছিয়ে বসে খেললেই চলবে। হরিপদবাবু তাঁর বাড়ি থেকে এক প্যাকেট পুরনো তাস। এনে দেবেন বলেছেন। খেলাটা সন্ধ্যাবেলাই লালমোহনবাবুকে মোটামুটি শিখিয়ে নেওয়া হবে।

ফেলুদার উত্তেজনা থাকলেও বোঝার উপায় নেই; সে সারাদিন মিউজিক এনসাইক্লোপিডিয়া পড়েছে। আর আমি পত্রিকার পাতা উলটেছি।

এই মেক-আপটা সহজ ছিল, তাই আমরা অনায়াসেই সাড়ে দশটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। ধুতিগুলোকে চায়ের জলে ভিজিয়ে একটু ময়লা করে

নিয়েছিলাম, চাদর আর তাস—দুটোই মেক্ষম এনেছিলেন, হরিপদবাবু। লালমোহনবাবুকে টোয়েন্টি-নাইন শিখিয়ে দুহাত খেলে নেওয়া হয়েছে, ভদ্রলোক খালি মনে মনে বিড়বিড় করে চলেছেন-গোলাম নহলা টেক্কা দশ সাহেব বিবি আট সাত।

গাড়িটাকে বড় রাস্তায় অন্ধকারে একটা জায়গায় পার্ক করে আমরা চারজন চাদর বগলে নিয়ে যদু নস্করের লেনে গিয়ে হাজির হলাম। অন্যদিন এ রাস্তায় পুলিশ থাকে, আজ ফেলুদার অনুরোধে নেই। রাস্তার এক পাশে একটা বিরাট জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে আচার্যদের বাড়ি। উত্তর দিকের ঘরগুলোর পিছন দিকটা রাস্তার উপর পড়েছে, তার মধ্যে বা দিকে, অর্থাৎ উত্তরপূর্ব কোণে, প্রথম হল লাইব্রেরি, আর তার পরেই হল প্রদ্যুন্নবাবুর শোবার ঘর। ঘরের সারির শেষে হল বাড়ির পিছনের দরজা, সেটা এখন বন্ধ। লাইব্রেরি। আর প্রদ্যুম্নবাবুর ঘর দুটোতেই বাতি জ্বলছে, তবে ভদ্রলোক যে কোন ঘরে রয়েছেন সেটা রাস্তা থেকে বোঝার কোনও উপায়। নেই।

আমরা চারজনে ল্যাম্প পোস্টের তলায় চাদর পেতে বসে গেলাম। ফেলুদা তার গায়ের চাদরের তলা থেকে একটা পানের ডিবে বার করে তার থেকে চারজনকে চারটে পান দিয়ে লালমোহনবাবুকে বলল, ‘গালে গুজে রেখে দিন; আর বার বার পিক ফেলবেন না।

আচার্য বাড়ি থেকে বোধহয় গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে এগারোটা বাজতে শোনা গেল।

উনিশ।

লালমোহনবাবু ফেলুদার পার্টনার হয়েছেন, এখন ডাকাডাকি চলছে। ফেলুদা সঙ্গে এক প্যাকেট বিড়ি এনেছে। তার থেকে একটা হরিপদবাবুকে দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে নিল। বিশ ফুটের বেশি চওড়া গলি নয়, আর তাতে লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে! ওপাশে কিছু দূরে একটা রিকশা দাঁড় করানো

রয়েছে, তার চালিকটা ঘুমিয়ে কাদা। আজ বোধ হয় অমাবস্যা, কারণ আকাশে মেঘ না থাকলেও বেশ ঘুটফুটে। মাথার উপর কালপুরুষ দেখা যাচ্ছে।

তুরুপআ মারুচি কাঁই?

লালমোহনবাবু উড়িয়া ভাষা বলতে চেষ্টা করে একটু বাড়াবাড়ি করছেন, তাই ফেলুদা একটা 'উঃ' শব্দ করে ওঁকে সতর্ক করে দিল। আশ্চর্য এই যে যদিও আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সময়কাটানো, টোয়েন্টি-নাইন খেলাটা এমনই যে এরই মধ্যে বেশ জমে উঠেছে। সময় কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে টেরই পাচ্ছি না। আচার্য বাড়িতে একটা ঢং শব্দ পেয়ে সাড়ে এগারোটা বেজেছে বুঝে বেশ অবাক লাগল। ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু একবার একটা বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করে বিশেষ জুৎ করতে না পেরে সেটা আবার ফেলে দিয়েছেন।

একটা কুকুরের ডাকে আরেকটা সাড়া দিয়েছে এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ আমার হাঁটুতে একটা হাত রাখল।

একটা লোক আসছে গলির পশ্চিম দিক থেকে। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, তার উপর একটা ছেয়ে রঙের চাদর জড়ানো। চাদর আমাদের গায়েও আছে, কারণ অক্টোবর মাসের রাত্তিরে বেশ চিনচিনে ঠাণ্ডা।

লোকটা আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল অন্য ফুটপাথ দিয়ে। সে হাঁটছে আচার্য বাড়ির গা ঘেঁষে।

এবার সে দরজার কাছাকাছি পৌঁছে হাঁটার গতি কামাল।

তারপর দরজার সামনে এসে থামল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্...

তিনটে মৃদু টোকা দরজার উপর। কান পেতেছিলাম বলে শব্দটা শুনতে পেলাম। দরজা খুলে গেল। অল্প ফাঁক, ঠিক যাতে একটা মানুষ ঢুকতে পারে। মানুষটা ঢুকে গেল। যে ঢুকাল তাকে আমরা তিনজনেই চিনি।

ইনি হলেন বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার অশ্বিনী ভড়।

ঘড়িতে ঢং ঢেং করে বারোটা বাজল।

অর্থাৎ অশ্বিনীবাবু ঢোকার পর পনেরো মিনিট হয়ে গেছে।

এবার ভদ্রলোক বেরোলেন। তাঁর সঙ্গে যদি কিছু থেকে থাকে তো সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই, কারণ হাত দুটো চাদরের নীচে।

ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেদিক দিয়েই আবার চলে গেলেন।

আমাদের পাহারা সার্থক এবং শেষ। এই দানটা খেলে উঠব, ফেলুদা ফিসফিস করে বলল। পরদিন সকালে ফেলুদা বাসপুকুরে ফোন করল প্রদ্যুম্নবাবুকে। আমি বসবার ঘরে মেন টেলিফোনে কান লাগিয়ে কথা শুনলাম।

কে, মিস্টার মল্লিক?

হ্যাঁ, কী খবর?

কাল রাত্রে কিছু হয়নি তো?

কই, না তো।

এক কাজ করুন; আমি ফোনটা ধরছি, আপনি একবার ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাজের ঘরে গিয়ে দেখে আসুন তো সব ঠিক আছে কিনা।

আধ মিনিটের বেশি ধরতে হল না। এবারে প্রদ্যুম্নবাবুর গলার স্বর একেবারে বদলে গেছে।

ও মশাই, সর্বনাশ হয়ে গেছে!

কী হল?

সব নতুন নাটক আর গান হাওয়া!

আমি আন্দাজ করেছিলাম বলেই ফোন করলাম।

এর মানেটা কী?

অন্য রহস্যগুলোর সঙ্গে আরেকটা যোগ হল।

আপনি কি আজ একবার আসছেন?

প্রয়োজন হলে যাব। তার আগে দারোগা সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে।

ফোনটা রেখে ফেলুদা মণিলাল পোদারের নম্বর ডায়াল করল।

শুনুন মিঃ পোদ্দার, গলি থেকে আপনার লোক সরিয়ে নেবার জন্য ধন্যবাদ। কাল সত্যিই কাজ হয়েছে। আপনি অশ্বিনীবাবুর দিকে দৃষ্টি রাখছেন

তো? উনি কিন্তু কাল রাত বারোটায় আচার্য বাড়িতে গিয়ে ইন্দ্রনারায়ণবাবুর বহুমূল্য সব কাগজপত্র সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

লোকটা খুব গোলমেলে, বললেন মিঃ পোদ্দার।খুনের টাইমের জন্য। ওর কোনও অ্যালিবাই নেই। সেদিন রাত্রে আচার্য বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফেরেনি। বলছে পথে ট্যাক্সি বিগড়ে যায় বলে আটকে পড়েছিল, কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপনার প্রোগ্রেস কেমন?

মোটামুটি ভালই। অবিশ্যি আমরা তো ঠিক এক রাস্তায় চলছি না, তাই আমার সিদ্ধান্তগুলো আপনার সঙ্গে মিলবে না।

তা না মিলুক। যে কোনও রকমে রহস্যের সমাধান হলেই হল।

ফেলুদা কোন রাস্তায় চলছে সেটা জানতে চাইলে উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই আর আমি ওদিকে গেলাম না। ফেলুদা ফোন রেখে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি। স্টেটসম্যানের পার্সোনাল কলামে একটা জরুরি বিজ্ঞাপন দিতে হবে। একটা ভাল বেহালার দরকার।

স্টেটসম্যানে পরদিনই বেরোল যে একটা উৎকৃষ্ট বিদেশি বেহালার প্রয়োজন, অমুক বক্স নাম্বারে লিখে খবর জানানো হোক।

এই বিজ্ঞাপনের উত্তর এসে গেল দুদিনের মধ্যে। চিঠিটা পড়ে ফেলুদা বলল, আমাকে একটু লাউডন স্ট্রিটে যেতে হচ্ছে, বিশেষ দরকার।

আধা ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে ফেলুদা বলল, বেজায় দাম চাইছে।

আমি বললাম, এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ে তোমার কি এই বয়সে বেহালা শেখার শখ হল?

ফেলুদা গম্ভীরভাবে বলল, ইট ইজ নেভার টু লেট টু লার্ন।

অর্থাৎ আরও রহস্য।

এদিকে লালমোহনবাবুও ঘন ঘন আসছেন আর ছটফট করছেন। একবার আমায় একা পেয়ে বললেন, তোমার দাদার সব ভাল শুধু এক এক সময় চুপ মেরে যাওয়ার ব্যাপারটা মোটে করদাস্ত করা যায় না।

বুধবার পার্সেনাল কলামে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, শুক্রবার উত্তর পেয়ে ফেলুদা লাউড়ন স্ট্রিটে গিয়েছিল, শনিবার সকালে দেখি ওর চেহারা একদম পালটে গেছে। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে বলল, আজি আচার্য বাড়ি যেতে হবে, কীর্ত্যিনারায়ণকে এখুনি ফোন করা দরকার।

কীর্তিনারায়ণ ফোন পেয়ে বললেন, আপনার কাজ কি মিটে গেছে!

তই তো মনে হচ্ছে, বলল ফেলুদা, তবে সেটা সম্পূর্ণ মিটবে একটা মিটিং করে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বললে পরে। আর সেই বলাটা বলতে হবে সকলের সামনে। অন্তত আপনি, আপনার দুই ছেলে, আর প্রদ্যুন্নবাবুকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে।

সেটা আর এমন কঠিন কী? এরা তো সবাই বাড়িতেই আছে। সে ব্যবস্থা আমি করছি; আপনি চিন্তা করবেন না। কটায় আসছেন?

এই ধরুন দশটা।

কীর্তিনারায়ণের পর মণিলাল পোদ্দারকে ফোন করে ফেলুদা দশটায় বোসপুকুরে আসতে বলল।

লালমোহনবাবু এলেন নটায়, আমরা সাড়ে নটায় চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আচার্য বাড়িতে পৌঁছে দেখি দারোগ সাহেব এসে গেছেন। ফেলুদা বলল, আজই ঘটনার ক্লাইম্যাক্স, অতএব আপনার থাকার প্রয়োজন।

দোতলায় যে বৈঠকখানায় প্রথম দিন কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আজও সেখানেই ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কীর্তিনারায়ণ এসে গেলেন।

কই, এদের সব ডাকো, প্রদ্যুম্ন।

প্রদ্যুম্নবাবু বেরিয়ে গেলেন দুই ছেলেকে ডাকতে।

প্রথমে এলেন দেবনারায়ণবাবু, আর এসেই বললেন, পুলিশ তো অনেক দূর এগিয়েছে বলে শুনেছি, তা হলে আবার এই ভদ্রলোকের বক্তৃতা শুনতে হচ্ছে কেন?

ফেলুদা বলল, পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে আমিও এগিয়েছি, কিন্তু সেটা একটু অন্য পথে। আর মার্ডার ইজ নট দ্য ওনলি ক্রাইম কমিটেড ইন দিস কেস– সেটাও আপনাকে জানানো দরকার। আমি পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার করে বলতে চেষ্টা করব।

ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রন্ট, সেইরকম একটা শব্দ করে দেবনারায়ণবাবু চুপ করে গেলেন। আসলে ভদ্রলোকের মুখে অষ্টপ্রহর পাইপ থাকে, বাপের সামনে সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে বোধ হয়। উনি আরও খাপ্পা হয়েছেন।

হরিনারায়ণবাবু এসে কোনও তম্বি করলেন না, কিন্তু তাঁর ভ্রূকুটি দেখে বুঝলাম যে তিনিও ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না।

সকলে উপস্থিত দেখে ফেলুদা আরম্ভ করল।

তাঁকে খুন করে কী লাভ হতে পারে। এইটে বিচার করার সময় আমরা জানতে পারি যে তিনি ছিলেন তাঁর বাপের প্রিয় পুত্র। অনুমান করা যায় যে কীর্তিনারায়ণের উইলে তাঁর ছেলের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাবে, এবং সেই ছেলে না থাকায় সে উইল বদল হবে। এই বদলানো উইলে তাঁর অন্য দুই ছেলের প্রাপ্তি বেড়ে গেলেও, যতদিন কীর্তিনারায়ণ বেঁচে আছেন। ততদিন তাঁরা এই টাকা পাচ্ছেন না। অর্থাৎ ভাইকে খুন করে তাঁদের ইমিডিয়েট কোনও লাভ নেই।

আরেকটা তথ্য আমরা জানতে পারি সেটা এই যে বীণাপাণি অপেরা ইন্দ্রনারায়ণকে ভারত অপেরা ছেড়ে তাদের দলে যোগ দেবার জন্য প্রলোভন

দেখাচ্ছিল, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ তাতে রাজি হননি। এই অবস্থায় ভারত অপেরাকে পঙ্গু করার জন্য ইন্দ্রনারায়ণকে খুন করার একটা কারণ থাকতে পারে। এ কাজটা বীণাপাণি অপেরা গুণ্ডা লাগিয়ে করতে পারে। খুনের দিন রাত এগারোটা পর্যন্ত ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কথা বলেন বীণাপাণি অস্পোরার ম্যানেজার অশ্বিনী ভড়। তিনি চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে খুনটা হয়।

এখানে আরেকটা তথ্য আমাদের খুব কাজে লাগে। আমরা লীনার কাছ থেকে জানতে পারি যে, ইন্দ্রনারায়ণের কাছে তাঁর লেখা পাঁচটি নতুন নাটক ও খান কুড়ি গান ছিল। যাত্রার বাজারে যে এ জিনিসের দাম অনেক সেটা আর বলে দিতে হবে না। আমরা জানি যিনি ইন্দ্রনারায়ণকে খুন করেছিলেন তিনি ইন্দ্রনারায়ণের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন, কিন্তু সময়ের অভাবেই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হাক, তার কিছুই সরাতে পারেননি। গত কাল রাত্রে বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার এসে নাটক আর গানগুলো নিয়ে গেছেন।

তা হলে অনুমান করা যায় যে খুনের একটা উদ্দেশ্য হতে পারে এই নাটক আর গানগুলি হাত করা। এ কাজ কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে সহজ নয়। কারণ ইন্দ্রনারায়ণের কাগজপত্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় থাকার সম্ভাবনা কম। ঘরের লোকের পক্ষে এ খবর জানা অনেক বেশি। স্বাভাবিক। ঘরের লোক যদি খুনের সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলো নাও নিতে পারেন, তার জন্য পরে সময় পেতে কোনও অসুবিধা নেই, কারণ কাগজগুলো থেকেই যাচ্ছে। এখানে আমাদের দেখা দরকার বাড়ির কোনও লোকের টাকার টানাটানি যাচ্ছিল। কিনা।

এ-ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে হরিনারায়ণবাবু সম্প্রতি তাঁর ক্লাবে বেশি টাকায় জুয়া খেলে অনেক লোকসান দিয়েছেন। কিন্তু তা হলেও হরিনারায়ণবাবুর পক্ষে ইন্দ্রনারায়ণের নাটক আর গান চুরি করে সেগুলো অন্য যাত্রা দলে বিক্রি করাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। তা হলে আর কে অভাবী ব্যক্তি আছেন বাড়িতে?

এখানে অকস্মাৎ একটি তথ্য আবিষ্কার করার ঘটনা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই।

প্রদ্যুম্নবাবু যেদিন আমার বাড়িতে আসেন সেদিন তাঁর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আমাদের সোফাতে পড়ে যায়। এই কাগজে ডট পেন দিয়ে দুলাইন কথা লেখা ছিল—হ্যাপি বার্থডে আর হুকুম চাঁদ। প্রদ্যুম্নবাবুকে জিজ্ঞেস করাতে উনি বলেন। কাগজটা ওঁর না। এর কিছুদিন পরে হঠাৎ শনিবারের কাগজের শেষ পাতায় একটি নামের তালিকা থেকে জানতে পারি যে হ্যাপি বার্থডে আর হুকুম চাঁদ দুটোই হল রেসের ঘোড়ার নাম। তখন আমার ধারণা হয় যে, প্রদ্যুম্নবাবু রেস খেলেন, কিন্তু সে তথ্য আমাদের কাছে গোপন রাখতে চান। আমরা সেদিনই রেসের মাঠে যাই। সেখানে আমি প্রদ্যুম্নবাবুকে দেখি ভিড়ের মধ্যে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বেটিং করতে। অর্থাৎ প্রদ্যুন্নবাবু যে জুয়াড়ি সেটা প্রমাণ হয়ে যায়। আমার ধারণা যারা নিয়মিত রেস খেলে এবং যাদের রোজগার খুব বেশি নয়, তাদের সব সময়ই টাকার টানাটানি হয়। সুতরাং রেসে যদি বড় রকম হার হয়ে থাকে তা হলে খুনের মোটিভ প্রদ্যুম্নবাবুর ছিল, এবং সেই সঙ্গে সুযোগও ছিল। সত্যি বলতে কী, তার চেয়ে বেশি সুযোগ এ বাড়ির কারুর ছিল না। খুনের সময় প্রদ্যুম্নবাবু কাজ করছিলেন, তাঁর পখে নাটমন্দিরের বারান্দা দিয়ে এসে ইন্দ্রনারায়ণের মাথায় বাড়ি মেরে কাজটা করা ছিল অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

প্রদ্যুম্ন মল্লিকের অবস্থাটা আরও টিলে হয়ে যায়। এই কারণেই যে তিনি হলেন মিথ্যেবাদী। তিনি শুধু রেসের ব্যাপারেই মিথ্যে বলেননি; তাঁর মতে ক'দিন আগে এ বাড়িতে আবার চোর আসে এবং সে চোরকে বাধা দিতে গিয়ে তিনি ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে হাঁটুতে চোট পান—যার ফলে তাঁকে নাকি খোঁড়াতে হচ্ছে। কিন্তু আজ সকালে তিনি অন্তত দুবার হাঁটার সময় খোঁড়াতে ভুলে গেছেন সেটা বোধহয় তিনি নিজে খেয়াল করেননি।

গত রবিবার রাত্তিরে ইন্দ্রনারায়ণের ঘর থেকে নাটক ও গানগুলি চুরি যায়। সেগুলো কার হাতে গেছে আমরা জানি, কারণ আমরা তখন বাড়ির পিছনের গলিতে ল্যাম্প পোস্টের আলোয় বসে তাস খেলছিলাম। বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার আসেন পৌনে বারোটায়। তাঁকে বাড়ির পিছনের দরজা খুলে দেওয়া হয়। প্রদ্যুম্নবাবুর ঘরের বাতি জ্বলছিল। আমাদের ধারণা তাঁর সঙ্গেই হয় লেনদেনটা। অশ্বিনী ভিড় টাকা দেন, প্রদ্যুন্নবাবু তার বিনিময়ে তাঁকে নাটক ও গানগুলো দেন। যদি আমি ভুল বলে থাকি তা হলে প্রদ্যুন্নবাবু আমাকে শুধরে দিতে পারেন।

প্রদ্যুম্নবাবুর মুখ ফ্যাকাসে, মাথা হেঁট, শরীরে কাঁপুনি। দারোগা সাহেব এগিয়ে গিয়ে তাঁর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়েছেন, ঘরে রয়েছে আরও দুজন কনস্টেবল।

এই হল ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য খুনের ইতিহাস, বলল ফেলুদা। কিন্তু এখানেই অপরাধের শেষ নয়। এবার আমি দ্বিতীয় অপরাধে আসছি।

আমি প্রথম দিন যখন এ বাড়িতে আসি তখন একটা ব্যাপার দেখে আমার একটু খটকা লেগেছিল। সেটা হল ইন্দ্রনারায়ণবাবুর বেহালা। একশো বছরের পুরনো বেহালা এত ঝকঝকে হয় কী করে? অবিশ্যি আমার বেহালার অভিজ্ঞতা কম, কত বছরে তার কীরকম চেহারা হয়। সেটা আমার জানা নেই, তাই ব্যাপারটা নিয়ে তখন আর মাথা ঘামাইনি। সেদিনই অবিশ্যি শুনেছিলাম যে কন্দর্পনারায়ণ রসিকতা করে তাঁর বেহালাকে বলতেন আম আঁটির ভেঁপু। সম্প্রতি দুটো জিনিস পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। এক হল পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে এক এনসাইক্লোপিডিয়া আর দুই হল কন্দর্পনারায়ণের বিলেতের ডায়রি। প্রথম বই থেকে আমি জেনেছি যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বেহালা বা যন্ত্রের সংস্কার হয় ইতালিতে। তখন থেকে বেহালার চেহারা এবং আওয়াজ পালটে আরও সুন্দর ও আরও জোরালো হয়। ইতালির বেহালা প্রস্তুতকারকদের মধ্যে

তিনজনের নাম সবচেয়ে বিখ্যাত। এরা তিনজনেই সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। প্রথম হল আনন্টন স্ট্রাডিভারি, দ্বিতীয় আন্দ্রেয়াস গুয়ারনেরি, আর তৃতীয় নিকোলে আমাটি। এর মধ্যে আমাটিই প্রথম বেহালার সংস্কার করেন ইতালির ক্রেমোনা শহরে।

তখনও আমার মাথায় আসেনি যে এই আমাটি আর কন্দর্পনারায়ণের আম আঁটি একই জিনিস। এটা পরিষ্কার হয় কন্দর্পনারায়ণের ডায়রি পড়ে। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ফেলুদা পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পড়ল—আই বঁট অ্যান আমাটি টুডে ফ্রম এ মিউজিশিয়ান হু ওয়জ স্যাঙ্ক ইন ডেট অ্যান্ড সোল্ড ইট টু মি ফর টু থাউজ্যান্ড পাউন্ডস। ইট হ্যাঁজ এ গ্লোরিয়াস টোন। অর্থাৎ আমি আজ একটি দেনায় জর্জরিত বাজিয়ের কাছ থেকে একটি আমাটি বেহালা কিমলাম দুহাজার পাউন্ডে। যন্ত্রটির আওয়াজ আশ্চর্য সুন্দর।–তখনকার দিনে দুহাজার পাউন্ড মানে বিশ হাজার টাকা! আজকে একটি আমাটি বেহালার দাম দেড়-দুলাখ টাকা।

এমন একটি বেহালা এই বাড়িতে এতকাল পড়েছিল, আর এই বেহালা যাত্রার কনসার্টে বাজাতেন। ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য। বেহালার আসল খবর কেউ জানতেন কি? আমার মনে হয় না। কীর্ত্তিনারায়ণবাবু বা দেবনারায়ণবাবু জানতেন, কিন্তু দুজনের জানার কথা। এক হুল প্রদ্যুম্ন। মল্লিক, যিনি দর্পনারায়ণের ডায়রি পড়েছিলেন, আরেক হল হরিনারায়ণবাবু। তিনি বিদেশি সংগীত সম্বন্ধে জানেন, ভাল বেহালার দাম জানেন, এবং এটাও নিশ্চয়ই জানেন যে বেহালার গায়ে দুদিকে যে ইংরিজি এস-এর মতো ফাঁক থাকে, তার একটায় চোখ লাগালে ভিতরে বেহালা প্রস্তুতকারকের নাম সমেত লেবেল দেখা যায়।

এই আমাটির কথা জানার পরেই আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হয় যে ইন্দ্রনারায়ণের খুনের পর তাঁর বেহালাটি সরানো হয়েছে এবং তার জায়গায়

একটি সস্তা নতুন বেহালা কিনে এনে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই বেহালা সরিয়েছে, কে, এবং যে সরিয়েছে। সে তো টাকার জন্যই সরিয়েছে?

আমার সন্দেহটা স্বভাবতই হরিনারায়ণবাবুর উপর পড়ে এবং এটাও বুঝতে পারি যে বেহালা পাচার হয়ে ঘরে টাকা এসে গেছে। তখন আমি ভাল বিদেশি বেহালা কিনতে চাই বলে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই। তার উত্তরে আমায় চিঠি লেখেন জনৈক মিঃ রেবেলো। এই রেবেলোর বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি একজন বিরাট প্রাচীন দ্রব্য বিক্রেতা—যাকে বলে অ্যানটিক ডিলার। তিনি বলেন তাঁর কাছে একটি আমাটি বেহালা আছে যেটা তিনি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করতে রাজি আছেন। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করি বেহালটা তিনি মিঃ আচার্যর কাছ থেকে কিনেছেন কিনা। তাতে তিনি হ্যাঁ বলেন এবং বলেন ইট ইজ দ্য ওনলি আমাটি ইন ইন্ডিয়া।

এই হল হরিনারায়ণবাবুর অপরাধের কাহিনী, এবং আমার বক্তৃতারও এখানেই শেষ।

আশ্চর্য এই যে ফেলুদার একটা কথাতেও কোনও প্রতিবাদ শোনা গেল না! প্রদ্যুম্নবাবু এখন মিঃ পোদারের জিম্মায়। হরিনারায়ণবাবু রাগ টিপে বসে আছেন মাথা হেঁট করে। দেবনারায়ণবাবু লজ্জায় লাল হয়ে ঘর থেকে চলে গেছেন। কীর্তিনারায়ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হরি যদি আমার বলত তা হলে আমি ওকে জুয়োর দেনা শোধ করার টাকা দিয়ে দিতাম। মিছিমিছি। আমাদের পরিবারের একটা আশ্চর্য সম্পত্তি সে বেহাত করল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন যে এত অসৎ তা আমি ভাবতে পারিনি। তাকে এইটুকুই বলতে পারি যে সে আমার পূর্বপুরুষের জীবনী লেখার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তার উপযুক্ত শাস্তি হলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।

***

কীর্তিনারায়ণের বোধহয় খুবই শখ ছিল যে কন্দর্পনারায়ণের একটা জীবনী লেখা হোক। না হলে আর লালমোহনবাবুকে তিনি অফারটা করেন?

আপনি তো লিখিয়ে মানুষ–রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক-তা কন্দর্পনরায়ণের চেয়ে বড় রহস্য আর রোমাঞ্চ একই লোকের জীবনে কিন্তু আর পাবেন না।

লালমোহনবাবু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ঘাড় কাত করে বললেন, আমাকে আর লজ্জা দেবেন। না, আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি, আমার লেখার কোনও মূল্যই নেই।

পরে অবিশ্যি উনি ফেলুদাকে বলেছিলেন, রক্ষে করুন মশাই-ওই খুন হওয়া বাড়িতে বসে। আমি কন্দর্পনারায়ণের জীবনী নিয়ে রিসার্চ করব!—বেঁচে থাকুক আমার রহস্য-রোমাঞ্চ, বেঁচে থাকুক প্রখর রুদ্র-অ্যান্ড লং লিভ দ্য থ্রি মাস্ কেটিয়ারস!